# স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

৭৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ৯ নভেম্বর ২০২০।।

২৩ কার্তিক - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। দীপাবলী সংখ্যা।।

website : www.eswastika.com

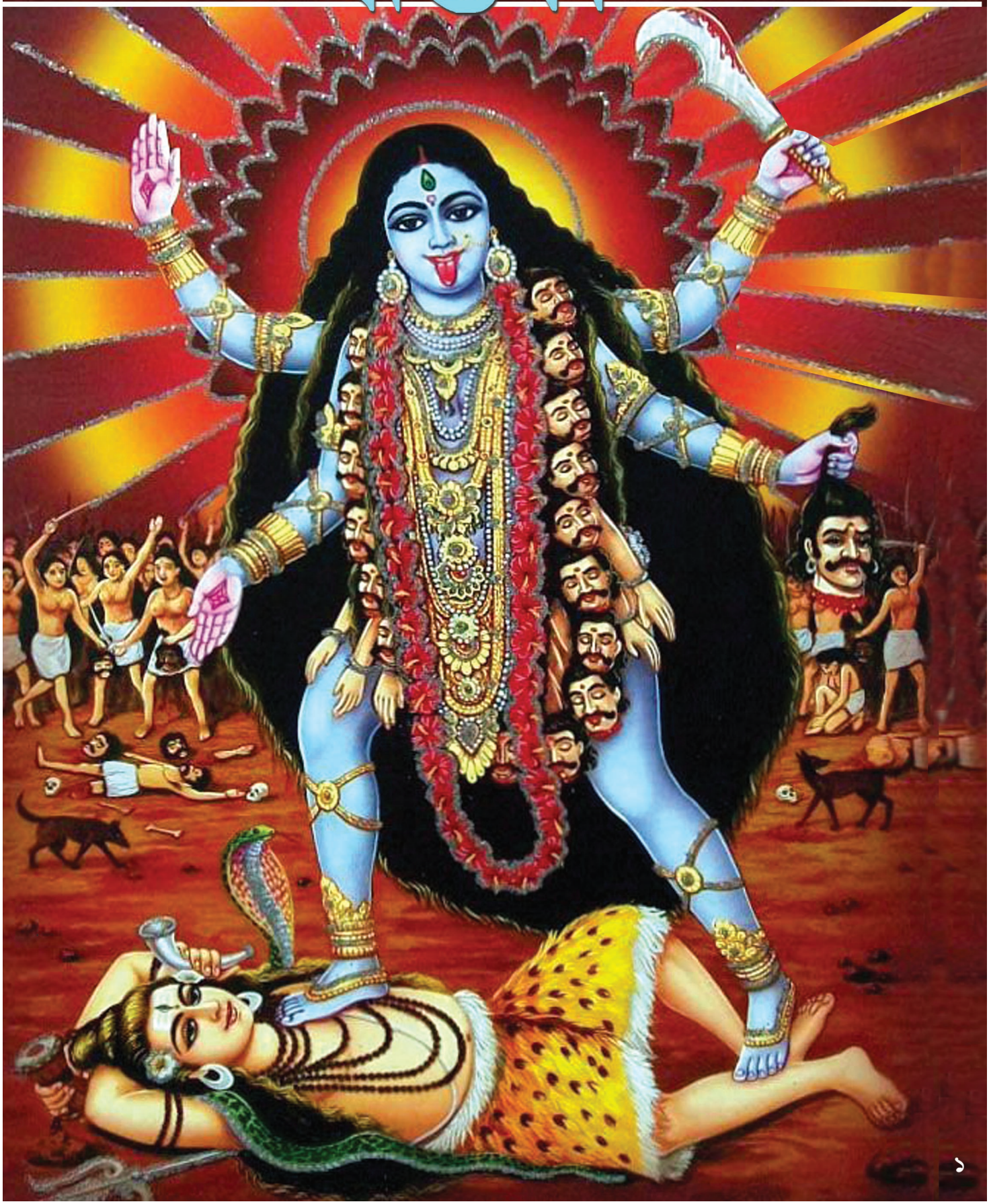

# SURYA

*Energising Lifestyles*

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

*lighting*

*fans*

*appliances*

*pipes*

**SURYA ROSHNI LIMITED**

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

**Toll Free No.: 1800 102 5657**

/suryalighting I /surya_roshni

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

**দীপাবলী সংখ্যা**

৭৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২৩ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৯ নভেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৪

**হিন্দু ভোট কিনতে মমতা ব্যানার্জি সরকারি অর্থ নয়ছয় করছেন** ▯ সুজিত রায় ▯ ৫

**আদ্যাশক্তি আরাধনায় দেবী কালিকা** ▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ৭

**কালীসাধিকা নিবেদিতা** ▯ সারদা সরকার ▯ ১২

**ভগিনী নিবেদিতার কালী চিন্তন** ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ১৪

**কলকাতার বারোয়ারি কালীপূজা** ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৬

**আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণে সমগ্র দেশবাসীর সহযোগিতা কাম্য ঃ মোহনরাও ভাগবত** ▯ ১৮

**চীনের দালাল পাকিস্তানের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গিলগিট বাল্টিস্তান** ▯ শিশির গুপ্ত ▯ ২৫

**একুশের নির্বাচনে বিজেপিকেই বরণ করবে বঙ্গবাসী** ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ২৭

**দিদির বোধোদয়, একুশে পরাজয়** ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩০

**বাংলাদেশ-সৌদি সম্পর্কে টানাপোড়েন, চীন ঘনিষ্ঠতাই কি কারণ?** ▯ ৩২

**একবছর পর জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ** ▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ৩৪

**অযোধ্যায় রামমন্দির, ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ** ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩৭

**ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি : কথায় ও কাজে** ▯ কল্যাণ কুমার নন্দী ▯ ৩৯

**ইতিহাসের বিকৃতি রাজনৈতিক চক্রান্তের অংশবিশেষ** ▯ বীরেন্দ্রনাথ শুকুল ▯ ৪৩


স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# এই অমানিশার অবসান হউক

দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার নিকট বাঙ্গালি হিন্দু বরাবর প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে মায়ের আগমনে যেন সকল দুর্গতির অবসান হয়। তেমনই মা কালীর নিকটও বাঙ্গালি হিন্দুর প্রার্থনা থাকে যেন এই অমানিশা দূর হইয়া আমাদের সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন আলোকিত হইয়া ওঠে। কিন্তু এবারে করোনা অতিমারীর কবলে সমগ্র বিশ্বই আর্থ-সামাজিক ভাবে ভয়ংকর সংকটের সম্মুখীন। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে বাঙ্গালি হিন্দু নিশ্চয়ই মায়ের কাছে নিবেদন করিবে পৃথিবী অতি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুক। এই প্রার্থনায় বিচিত্র কিছু নাই, কিন্তু এই সঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে মায়ের ত্রিমূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। এই ত্রিমূর্তির সহিত পৌরাণিক উপাখ্যানের হয়তো বিশেষ সাদৃশ্য নাই, তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর ভাবব্যঞ্জনাবাহী ও প্রতীকীও বটে। বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীন ভারতবর্ষে বসিয়া বঙ্গজননীর হৃতসর্বস্ব, নিরাভরণ যে মূর্তি মা কালীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আজ স্বাধীন ভারতে বঙ্গপ্রদেশের সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। চৌত্রিশ বৎসরের বাম শাসনে এবং পরবর্তী নয় বৎসরের অধিক সময়ের তৃণমূলি অপশাসনে এই রাজ্যের মানুষের নাভিশ্বাস উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। একের পর এক দুর্নীতি , আর্থিক কেলেঙ্কারি, খুন-জখম, অত্যাচারে রাজ্যের মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নতি চোখে নিশ্চয় পড়িবে, কিন্তু তাহা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়াছে সীমাহীন মিথ্যাচার, অপপ্রচার আর দেশের খাইয়া পড়িয়া দেশেরই সর্বনাশ করিবার নির্লজ্জ মানসিকতা, যাহা স্বাধীনতার পর নেহরু গোষ্ঠী ও কমিউনিস্টদের মজ্জাগত, তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বিকিয়া যাইয়া এখন অন্যত্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে— তাহাও যথেষ্ট চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি প্রতিহিংসার শিকার এক স্বনামধন্য সাংবাদিকের গ্রেপ্তারির সংবাদে মূলত কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পরিচালিত সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে যে স্থূল, নগ্ন, অসংযত প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে, তাহতে এই দেশে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং করোনা মহামারীর সঙ্গে দেশের উন্নতির এই প্রতিবন্ধকতাগুলিও দূর হইয়া একবিংশ শতাব্দীতে আত্মনির্ভর নূতন ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করুক, মা কালীর নিকট এই প্রার্থনা সমগ্র বাঙ্গালি একান্তভাবেই জানাইবেন।

ইতিহাসের দিকে তাকাইলে নিদর্শন মিলিবে যে, শক্তিসাধনা অর্থাৎ কালীপূজা বাঙ্গালির একটি বহুমূল্য সম্পদ। ষোড়শ শতাব্দীতে নদীয়ার তান্ত্রিক আচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যে মাতৃরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই কল্পিত কালীপ্রতিমা বঙ্গপ্রদেশের ঘরে ঘরে পূজিত— এই কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাই তন্ত্র সাধনার সঙ্গে কালীমূর্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তবে স্বদেশীযুগে বঙ্গপ্রদেশের অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের কালীমূর্তির সামনে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করিবার যে রীতি চালু হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ বিপিন চন্দ্র পাল তাঁহার বিভিন্ন রচনায় করিয়াছেন, তাহাই উপাস্য কালীমূর্তির গুরুত্ব প্রতিভাত করিতেছে। কেবল দেশপ্রেমের ক্ষেত্রেই যে দেবী কালিকার গুরুত্ব সীমাবদ্ধ নহে, আধ্যাত্মিকতায়ও যে তাহার চূড়ান্ত ব্যাপ্তি রহিয়াছে, তাহা সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপার মতো প্রসিদ্ধ কালী সাধকরা প্রমাণ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা 'কালী দ্য মাদার' পুস্তকে মাতৃরূপের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেশের মানুষের তো বটেই, ইউরোপ-আমেরিকার মানুষেরও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাহার ফলস্বরূপ পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই দর্শনই বাঙ্গালির কালীপূজাকে অনন্য করিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা ও স্বাদেশিকতার ঐক্যে অতীতে আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে তাহার যে গুরুত্ব ছিল, আজকের দিনেও তাহা সমগুরুত্বের দাবিদার। ভারতবাসী, বিশেষত বাঙ্গালির মনে ক্ষাত্রবীর্যে আজ বড়োই অভাব। অতীত হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নিছক উপাসনার গণ্ডী ছাড়িয়া মা কালী ক্রমে সেই ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালির বর্তমান কালী উপাসনা কেবল পূজাপাঠের মধ্য দিয়া নয়, বীরত্বের সাধানই মুখ্য উপজীব্য হইয়া উঠুক। ভারতবর্ষের অমানিশা দূর করিতে হইলে এই সাধনা আমাদের করিতেই হইবে।

## সুভাষিতম্

*নির্ধনশ্চাপি কামার্থী দরিদ্রঃ কলহপ্রিয়ঃ।*

*মন্দশাস্ত্রো বিবাদার্থী ত্রিবিধং মূর্খলক্ষণম্।।*

নির্ধন হয়েও বড়ো বড়ো ইচ্ছা পোষণ করা, যাচক হয়েও কলহে জড়িয়ে পড়া এবং জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে তর্ক করা — এই তিনটি মূর্খের লক্ষণ।

# হিন্দু ভোট কিনতে মমতা ব্যানার্জি সরকারি অর্থ নয়ছয় করছেন

**সুজিত রায়**

তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল, বাড়তি হারে রেশন সামগ্রী পাবেন রাজ্যবাসী আগামী বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত।

না, মিলছে না। রেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল, কোভিড মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ হবে সেরা। হয়নি। গোটা বিশ্বে যখন কোভিড হেরে যাওয়ার মুখে, তখন এরাজ্য এগোচ্ছে কোভিড সংক্রমণে ভারতশ্রী হওয়ার পথে।

তিনিই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে চিৎকার করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। অথচ রেলদপ্তর যখন এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের পৌঁছে দিল পশ্চিমবঙ্গে, তখন তাঁরা কোনও পরিষেবাই পেল না। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতির কথাই বলছিলাম, যিনি বলেছিলেন ক্ষমতায় আসার আগে—

(ক) কলকাতা লন্ডন হবে।

(খ) দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হবে।

(গ) প্রত্যেক জেলায় হবে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। কলকাতা এখন গোটাটাই বস্তির মতো কদর্য নোংরা। দার্জিলিং এখন রাজনৈতিক জ্বরে কাঁপে বেশি। বরফ পড়ে কম।

আর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরে মরে রাজ্যবাসী। চিকিৎসা তো দূরের কথা, ডাক্তারই মেলে না। এটাই ওনার দস্তুর। বলেন, করেন না। প্রশ্ন করলে বলেন, 'কেন্দ্র টাকা দেয় না। করব কোত্থেকে? ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব?'

কিন্তু দেখুন, এবার দুর্গাপুজোয় রাজ্যের ৩৭ হাজার পুজো কমিটির জন্য কেমন স্বচ্ছন্দে রাজ্যের অর্থকোষ থেকে বিনা দ্বিধায় কল্পতরু হয়ে বিলিয়ে দিলেন ১৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি পুজো পিছু ৫০ হাজার টাকা। ২০১৯ সালেও দিয়েছিলেন। প্রতি পুজো পিছু ২৫ হাজার টাকা। ২০১৮ সালেও। প্রতি পুজোর জন্য ১০ হাজার টাকা। না, কেউ চায়নি টাকা। কোনো পুজো কমিটি নয়। কোনো ব্যক্তিও নয়। তিনিই দিচ্ছেন স্বেচ্ছায়।

> "বহু মুসলমান মানুষ এখন খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়েই বলতে শুরু করেছেন, মমতার মুসলমান সমাজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটা ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এখন জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের মুখোমুখি। বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর মতো 'ঘরের মেয়ে'কেও একবার হিজাব পরতে হবে আর একবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে চণ্ডীস্তব করতে হবে।"

আর দিচ্ছেন এমনভাবে যেন নিজের সিন্দুক ভেঙে টাকা বিলোচ্ছেন অতীতের বাবু সমাজের বাবুদের মতো, যাঁরা বেড়ালের বিয়ে দিয়ে বা পায়রার বিয়ে দিয়ে এক রাতেই উড়িয়ে দিতেন কোটি টাকা। কিংবা একরাতে বেশ্যামজলিশে অকাতরে হরির লুট দিতেন স্বর্ণমুদ্রা। না, মাননীয়ার একবারও মনে পড়ে না, টাকাটা সরকারের মানে জনগণের। সরকারটা যেমন ওনার বাপের সম্পত্তি নয়, তেমনই সরকারি অর্থও ব্যক্তিগত উপার্জনের অর্থ নয়।

এর আগে চলতি অর্থবর্ষেই ২৬ হাজার ক্লাবকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তার আগের তিন বছর ক্লাবগুলো পেয়েছিল ১ লক্ষ টাকা প্রতি ক্লাব। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার মান এবং পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতি পরীক্ষা না করেই দেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকার স্কলারশিপ। কন্যাশ্রী প্রকল্পে 'কন্যা'রা স্কুলে যাচ্ছে কী যাচ্ছে না, না দেখেই বিলোনো হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। কন্যাশ্রীতে। রূপশ্রীতেও। রূপশ্রী প্রকল্পে মেয়েদের সত্যিই বিয়ে হচ্ছে নাকি বিয়ের নাটক হচ্ছে তা দেখা হচ্ছে না।

অতি সম্প্রতি যা ঘোষণা করেছেন তা হলো হিন্দু পুরোহিতদের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা ভাতা প্রদান আর যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি নেই, তাদের বাসস্থানের প্রতিশ্রুতি। (ভুললে চলবে না, মুসলমান ইমামরা পাচ্ছেন প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা)।

আরও আছে। এবার পুজোয় রাজ্য সরকার অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা খাতে পুজো কমিটিগুলোর কাছ থেকে কোনো অর্থ নেয়নি। কোনো কর্পোরেশন বা পুরসভা কোনো কর নেয়নি। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর এবং সিইএসসি কর্তৃপক্ষ মোট বিদ্যুৎ খরচের ৫০

শতাংশের মূল্য মকুব করে দিয়েছেন। ২০২১-এ ভোটের আগে হয়তো দেখা যাবে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী মনসাপুজোয়, সন্তোষীমায়ের পুজোয় কিংবা বনবিবির পুজোতেও লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করছেন।

কারণ?

কারণ একটাই— হিন্দু ভোটটা হারানো যাবে না।

২০১৯-র লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতাময়ী ছিলেন শুধুমাত্র সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি। হিজাব পরে আল্লার দোয়া মাঙার নাটকে তাঁর মতো দক্ষ কুশীলব আজকের রাজনীতিতে আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে ঘাবড়ে গেলেন। বুঝে গেলেন তাঁর রাজনীতির টেকটোনিক প্লেট হিন্দুদের কাছ থেকে সরতে শুরু করেছে। অতএব ভেক পালটাও। হিজাব ছাড়ো— ধরো হিন্দু নারীর শাড়ির আঁচল। নইলে শিয়রে শমন। তাই পুজোয় ৫০ হাজারের ডোল। তাই পুরোহিত ভাতা। তাই মাগনায় বিদ্যুৎ, ফায়ার ব্রিগেড পরিষেবা। আর যাতে এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধাচরণে কোনো সংবাদমাধ্যম না মেতে ওঠে তাই তড়িঘড়ি এটাও ঘোষণা হয়ে গেল— সরকারি মান্যতাপ্রাপ্ত সব সাংবাদিককে দেওয়া হবে পুজোর বোনাস। আসলে ভিক্ষে ২০০০ টাকা। তার জন্যই মারামারি, কাড়াকাড়ি। যেমন সাংবাদিক মহলে, তেমনি পুরোহিত মহলে, তেমনি দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাঁরা পুজো প্যান্ডেলের নেপথ্যে অস্থায়ী অ্যান্টি চেম্বারে সদগতি করেন গায়ের জোরে আদায় করা চাঁদার টাকার কিংবা সরকারি ঘুষের।

এতদিন লোকে জানত, ঘুষ নেয় সরকারি কর্মচারীরা। ঘুষ নেয় পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা, মায় মন্ত্রীরাও। অর্থাৎ ঘুষ নিত সরকার। এখন সরকারই ঘুষ দিচ্ছে। দুটো কারণ : (১) সরকার যে বিশাল পরিমাণ বেআইনি অর্থের ভাণ্ডার গড়েছে, তার খবর যাতে না বেরোয়। তা নিয়ে মানুষ যাতে মাতামাতি না করে। (২) আসন্ন বিধানসভা ভোটের জন্য ভোটটা কিনতে হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, হিন্দু ভোট— এ রাজ্যে যাঁদের সংখ্যা শতাংশের হিসেবে প্রায় ৭৪ শতাংশ। যে ৭৪ শতাংশের সিংহভাগই ২০১৯-র পর থেকেই স্রোতের মতো মিশতে শুরু করেছে গেরুয়া রঙে। মানুষ উদগ্রীব— ভোটবাক্সে মাননীয়ার নির্লজ্জের মতো মুসলমান তোষণের প্রতিটি পদক্ষেপের সদুত্তর দিতে।

প্রমাদ গুনছেন মমতার রাজনৈতিক বিশ্বকর্মা প্রশান্ত কিশোরও। তাঁরই বুদ্ধিতে মমতা অকাতরে ঢেলে চলেছে সরকারি অর্থ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। কারণ মুসলমান মহল থেকে পরিষ্কার হুমকি এসে গেছে— পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা ডাঙায় বাঘ, জলে কুমিরের মুখোমুখি। মুসলমান সমাজের উন্নয়নে কোনো প্রকল্প গড়েননি মমতা। মুসলমান সমাজ শিক্ষিত হয়নি। মুসলমান বেকার যুবক-যুবতীরা চাকরি পাননি। মুসলমান যুবক রাজ্যে ছোটোখাটো ব্যবসা করার সুযোগও পায়নি। বরং রাজ্যের মুসলমান সমাজকে ক্রিমিনাল হয়ে উঠতে বাধ্য করেছেন মাননীয়া। অল বেঙ্গল মাইনরিটি ইয়ুথ ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মহম্মদ কামারুজ্জমানই শুধু নয়, রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীও প্রকাশ্য জনসমাবেশে এরকম অভিযোগই এনেছেন। বহু মুসলমান মানুষ এখন খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়েই বলতে শুরু করেছেন, মমতার মুসলমান সমাজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটা ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এখন জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের মুখোমুখি। বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর মতো 'ঘরের মেয়ে'কেও একবার হিজাব পরতে হবে আর একবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে চণ্ডীস্তব করতে হবে।

তার ওপর থেকে থেকেই মিম নেতা ওয়েইসি হুংকার ছাড়ছেন— এবার লড়বেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আর যদি তা করেন, তাহলে মমতার সাধের মুসলমান ভোটে কালনেমি ওয়েইসি যে তাঁর বিশাল থাবাটা বসাবেনই তাতে সন্দেহ কী?

আসলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে যতই চালাক ভাবুন, যতই ভাবুন তিনি রাজনীতিটা বোঝেন ভালো, আসলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। তিনি একটা বিষয় এখন হাড়ে হাড়ে টের পেলেও আগে বোঝেননি যে রাজ্যের মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছেন। চাইছেন এই কারণেই যে তাঁদের স্বপ্নপূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন মমতা। চাইছেন এই কারণেও যে পশ্চিমবঙ্গ এবার কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের পথ ছেড়ে কেন্দ্র-রাজ্য সম্প্রীতির পথে হাঁটুক। বামফ্রন্টের ৩৪ বছর ও তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ বছর— এই ৪৪ বছরে রাজ্যটা সর্বহারা হয়েছে। ওই একটি কারণেই। কেন্দ্রের সঙ্গে কারণে-অকারণে সংঘাত সৃষ্টি করে।

মমতা আরও একটা বিষয়ে ভুল পথে হেঁটেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকেও তিনি সামলে নেবেন অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার মনমোহন সিংহের মতোই। মমতা বাঘ আর বাঘরোলের তফাতটা বোঝেননি। ফলে ২০১৯-এই মোদীর কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে নিজেই কুপোকাত হয়ে পড়েছেন। এখন তিনি সপ্তরথীর চক্রব্যূহে আবদ্ধ। একদিকে গোটা ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দেবার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে গোটা দেশ থেকেই গলাধাক্কা খেয়েছেন, অন্যদিকে, মোদীর বিরোধিতাকে মূলধন করে বিজেপির সর্বনাশ করতে গিয়ে বিজেপিকেই ফের অনেক বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে আসতে সাহায্য করে ফেলেছেন। বোঝেননি, বিজেপি দলটা পশ্চিমবঙ্গের সিপিআইএম নয়। তাই তাঁর জয় শ্রীরাম ধ্বনির তীব্র বিরুদ্ধাচারণকেও গিলতে হচ্ছে দুর্গামন্ত্র জপ করে প্রকাশ্যে। তাই রামমন্দিরের বিরোধিতায় তিনি আগের মতো সোচ্চার হননি।

এবার হয়তো দেখা যাবে, তিনি হনুমান মন্দিরেও পুজো দিতে যাচ্ছেন সাড়ম্বরে ভাইপো আর প্রশান্ত কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে। আর যত এমন করবেন ততই তাঁর পায়ের তলার মাটি আলগা করবেন শুভেন্দু অধিকারী, সব্যসাচী দত্তরা। ততই একটা একটা করে খসবে প্রাসাদের ভঙ্গুর খিলান। আর সেই ভেঙে পড়া প্রাসাদ থেকে হয়তো ভেসে আসবে একটাই বাণী— 'তোর চৈতন্য হোক।' ▯

# আদ্যাশক্তি আরাধনায় দেবী কালিকা

**রামানুজ গোস্বামী**

দেবী কালিকার আরাধনা ভারতে অতি প্রাচীন। বেদ, পুরাণ সবেতেই এর উল্লেখ আছে। পুরাণ বলতে সাধারণত বোঝানো হয় পুরানো বা 'পুরাতন' যা কিছু; কিন্তু আচার্য শঙ্কর এর অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। তা হলো 'পুরা অপি নবঃ', অর্থাৎ পুরাতন হলেও যা নবীন বা নতুন। শক্তি সাধনার তাৎপর্য বা মাতৃপূজার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। এর তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনেও এতটুকু কমেনি, বরং বেড়ে গিয়েছে। আমাদের চিরদিনের আরাধ্যা দেবী শ্যামা, মা কালী। বঙ্গদেশে কালীমন্দিরের সংখ্যা অগণিত। এর মধ্যে যেমন রয়েছে শক্তিপীঠ, তেমনি আছে সিদ্ধপীঠও। এই পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে কালীঘাটের মতো মহাতীর্থ, আবার দক্ষিণেশ্বরের বা তারাপীঠের মতো পুণ্যভূমিও। কালীসাধনা যেন বঙ্গভূমির প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যেই মিশে আছে। একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই বঙ্গদেশে (এখানকার পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ একত্রে) শক্তিসাধনা অতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বিধর্মী মুসলমানের অত্যাচার, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসসাধন, কালাপাহাড়ের পৈশাচিক আক্রমণ— এত সবের পরও বাঙ্গালির মাতৃসাধনা আজও অমলিন।

দেবী কালিকা হলেন সর্বসিদ্ধির অধীশ্বরী, তিনিই মহামায়া, তাঁর নানান রূপ, নানা নাম। শক্তিতত্ত্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কালীরই আরাধনা করা হয়ে থাকে। সেজন্য তান্ত্রিক বা শাক্তরা বা মাতৃসাধকেরা মূলত কালীরই অর্চনা করে থাকেন।

তারা দেবীকেও দেবী কালিকাজ্ঞানে পুজো করার বিধি রয়েছে।

মায়াতন্ত্র অনুসারে—

'কালীবদাচয়েৎ বিদ্যাং কালীবৎ পূজয়েৎ সদা।
কালীবৎ সাধয়েৎ দেবীং কালীবৎ চিন্তয়েৎ সদা।।'

আবার এমনটাও বলা হয়েছে—

'যা কালী মহাদুর্গা মা দুর্গা সৈব তারিণী।
অভেদেন যজেদ্দেবীং সিদ্ধয়োহষ্টৌ ভবন্তি হি।।'
ত্বমেব সূক্ষ্মাত্বং স্থূল ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।।

—মহানির্বাণতন্ত্র

কালী তাই নিরাকারা, আবার সাকারাও। নির্গুণা, আবার সগুণা, কেশবচন্দ্র প্রশ্ন করছেন আর ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন। 'কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোনো রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোনো রং নেই।'

কালী বা দেবী কালিকা রহস্যময়ী। কালীতত্ত্ব তাই সর্বসাধারণের কাছে অতি কঠিন ও রহস্যাবৃত। বহু শাস্ত্রে, বহু পুরাণে এবং বিভিন্ন মতে নানাভাবে আদ্যাশক্তি মহামায়ার এই কৃষ্ণবর্ণা রূপটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু দেব-দেবীরা সকলেই হয় শ্বেতবর্ণা, নয়তো-বা

উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। ব্যতিক্রম কেবল দেবী কালিকা। তিনি কৃষ্ণবর্ণা।

কালীর রূপটি একটু চিন্তা করা যাক। দেবী চতুর্ভুজা। তিনি দিগ্‌বসনা। নৃমুণ্ডমালিনী। তাঁর অস্ত্র শাণিত খড়্গ, অসুরের রক্তে রঞ্জিত। তাঁর একটি হাতে সদ্যচ্ছিন্ন অসুরের মস্তক, দেবী শ্মশানবাসিনী। অন্য দুই হস্তে বরাভয়। পদতলে শায়িত মহাদেব । এহেন দেবী লোলজিহ্বা। এইসবের মধ্যে একটা খুব সুন্দর প্রতীকী অর্থ আছে। কালীর গাত্রবর্ণ কেন কালো? কালকে যিনি কলন করেন, তিনিই কালী। মহাকালের জন্মদাত্রী হলেন এই দেবী। এমনটাও প্রশ্ন আসতেই পারে যে, দেবী বিবসনা কেন? উত্তরও আছে তার। কালী হলেন স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি সমস্ত পাশ থেকে মুক্তা। পাশ অর্থে বন্ধন। তিনি ত্রিগুণাতীতা।

'পাশবদ্ধো ভবেৎজীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।।'

দেবী কালিকার পরমতত্ত্বে শিব যেন পুরুষের প্রতিমূর্তি। তিনি নিষ্ক্রিয়। সৃষ্টির কাজে প্রকৃতি রূপী কালীই প্রধানা। নিষ্ক্রিয় শিব শব রূপে পদতলে শয়ান। আবার, দেবীর গলায় যে মুণ্ডমালা রয়েছে, তাতে একান্নটি মুণ্ড সন্নিবিষ্ট। এইগুলি একান্নটি বর্ণের প্রতীক। জীবের চৈতন্য তথা চিৎ শক্তির নির্ণায়ক। নিগূঢ়ানন্দের মতে, কালীর জিভ পরমাপ্রকৃতির ভারসাম্যের প্রতীক। তাঁর মতে, বাম হস্তের সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ডটি একটি সৃষ্টির নির্দেশক।

কোনো কোনো গবেষকের মতে কালীর জিহ্বা রসনাকে সংযত করার নির্দেশ প্রদান করে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমের পূর্বে আবশ্যক জিহ্বাকে বশে আনা। আহার, বাক্-সংযম ইত্যাদি তো ইন্দ্রিয় সংযমের একেবারে গোড়ার কথা। দেবীর এই ভয়ংকরী মূর্তিতে যেন তারই নির্দেশ পাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ এমনটাও মনে করেন যে, এটি আসলে রজোগুণের আধিক্যকে সত্ত্বগুণ দ্বারা দমন করাকেই বোঝায়।

ফিরে আসি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়। আলোচনার সুবিধার্থে দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রচলিত ধ্যানটি এখানে সম্পূর্ণ উল্লেখ করা গেল। এরপর তার বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে আমরা একটু আলোচনা করব। কালীতন্ত্র মতে দেবীর ধ্যানটি নিম্নরূপ—

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।।
সদ্যচ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃ পাণিকাম্।।
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চিতাম্।।
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত ধারাবিস্ফুরিতাননাম্।।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসিনীম্।
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাম্।।
দন্তুরাং দক্ষিণং ব্যাপী মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং।।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম্।।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামার্থসিদ্ধিদাম্।।

—অর্থাৎ, "দেবী করালবদনা। ভয়ংকরী, মুক্তকেশী ও চতুর্ভুজা। গলদেশে মুণ্ডমালা দোদুল্যমান। তাঁর নিম্ন বামহস্তে সদ্যছেদিত মুণ্ড; ঊর্ধ্ব বামহস্তে তীক্ষ্ণধার খড়্গ। নিম্ন দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা ও ঊর্ধ্ব দক্ষিণহস্তে বরমুদ্রাশোভিত। তাঁর বর্ণ ঘনমেঘের ন্যায় ও তিনি দিগ্‌বসনা। মুণ্ডমালার ক্ষরিত শোণিতে তাঁর সর্বাঙ্গসিক্ত। দেবীর দুই কর্ণে দুটি শিশুশব কুণ্ডলরূপে শোভা পাচ্ছে। তার ফলে দেবীকে অতি ভয়ংকরী প্রতীত হচ্ছে। দন্তপংক্তিও ভয়ংকর ও স্তনযুগল স্থূল এবং উন্নত, শবহস্তে দ্বারা নির্মিত অলংকারে তাঁর কটিদেশ শোভিত। তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তের ক্ষরিত শোণিত ধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। তাঁর গভীর হুংকার ধ্বনির শব্দে চারিদিক মুখরিত, দেবী শ্মশানবাসিনী। দেবীর ত্রিনয়ন নবোদিত সূর্যের ন্যায় রক্তাক্ত ও উজ্জ্বল, উচ্চ দন্তপংক্তি বাহিরে প্রকাশমান। দক্ষিণব্যাপী মুক্ত তাঁর কেশপাশ। শবরূপী মহাদেবের উপর দেবী অবস্থিতা। শৃগাল প্রভৃতি তাঁর চতুর্দিকে ভয়ংকর শব্দ করতে করতে প্রদক্ষিণ করছে। দেবী মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্ত। দেবীর বদনমণ্ডল সুপ্রসন্ন ও হাস্যযুক্তা। এইরূপে সর্ববাসনা ও অভীষ্ট পূর্ণকারিণী দেবী কালিকার ধ্যান করা অবশ্য কর্তব্য।"

এই পরিসরে একটি কাহিনি উল্লেখ করা দরকার। পুরাণে আছে অবন্তী নামে কোনো এক নগরে বলাসুর নামে এক ভয়ংকর অত্যাচারী দানবের বাস ছিল। দেবী উগ্রতারা রূপে এই অসুরকে প্রচণ্ড যুদ্ধে নিহত করেন। এই সময়ে প্রচণ্ড ক্রোধে দেবী যেন অসুরের রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছিলেন। শুরু করলেন মহাভয়ংকর তাণ্ডব নৃত্য। সৃষ্টি ও সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন কেঁপে উঠল। দেবীর সেই প্রলয়ংকরী রুদ্র মূর্তির সামনে স্বর্গের দেবতারাও হলেন ভীত, সন্ত্রস্ত। উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে তাঁরা মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। শিব তখন শিশুর বেশে দেবীর সামনে এসে ক্ষুধায় কাঁদতে লাগলেন কাতরভাবে। মুহূর্তে দেবীর তাণ্ডবনৃত্য থেমে গেল। তিনি শিশুরূপী শিবকে কোলে তুলে নিয়ে স্তন্যপান করালেন। এ যেন চিরন্তন মায়ের দৃশ্য। আবার এই প্রসঙ্গে একটি বহুলপ্রচলিত কাহিনির উল্লেখ করব, যা হয়তো আমাদের সকলেরই জানা। দেবীকে শান্ত করতে মহাদেব শবরূপে পথিমধ্যে অবস্থান করছিলেন। দেবী তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে সহসা আপন পতির বক্ষোপরি পদস্থাপন করেন ও নিদারুণ লজ্জায় জিহ্বা বিস্তার করেন।

রামায়ণ, মহাভারতেও রয়েছে কালীর প্রসঙ্গ। আমরা জানি যে, রাবণপুত্র মেঘনাদ নিকুম্ভিলাদেবীর উপাসনা করতেন। এই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারেই লক্ষ্মণ তাঁর সাধনা ভঙ্গ করেন। এই নিকুম্ভিলাদেবী কিন্তু আর কেউ নন। তিনি হলেন ভদ্রকালী স্বয়ং। আবার মহাভারতেও দেখা যায় দুর্গা, কাত্যায়নী ও ভদ্রকালীর প্রসঙ্গ একাধিকবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও রয়েছে কালীর আখ্যান। তিনি পাশহস্তা দেবী নিঋতি। এঁর কথা আমরা বৈদিক যুগেও দেখতে পাই।

ইনিই কৃষ্ণা মহাভয়ংকরী কালিকা। মহানির্বাণতন্ত্রের মতেও কালী হলেন কালের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী। তাই তিনি মহাকালী। শ্রীরামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠদেব ছিলেন তারাদেবীর উপাসক। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ তারামন্ত্রের অনুশীলন করতেন সিদ্ধিলাভের প্রয়াসে। কিন্তু বিধির অমোঘ বিধানে তিনি সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হন। এরপর দৈববাণী শ্রবণ করে তিনি সুদূর মহাচীনে যান। সেখানে বুদ্ধরূপী জনার্দন তাঁকে 'চীনাচার' মতে দেবীর উপাসনার নির্দেশ দেন। অবশেষে এই মতেই সিদ্ধ হন বশিষ্ঠদেব। আজও তাঁর সিদ্ধাসন রয়েছে তারাপীঠে, যে আসনে বসে সিদ্ধ হয়েছেন সিদ্ধ ভৈরব বামাক্ষ্যাপাও। এই চীনাচার অতি কঠিন। প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্য না পেলে এই মতে সাধনা করতে যাওয়াটা শুধু মূর্খামিই নয়, এতে এমনকী নিজের প্রাণসংশয়ও হতে পারে।

বৈদিক যুগেও যে দেবীর অর্চনা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ মুণ্ডক উপনিষদে। যজ্ঞ বা হোমের যে পবিত্র অগ্নি, তার সাতটি জিহ্বার নাম পাওয়া যায় এইভাবে— কালী, করালী, লোহিতা, মনোজবা, সুধুম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী।

এবার একটু কাহিনিমূলক প্রসঙ্গে আসা যাক। সপ্তশতী শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য একটি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। যা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। এতেও আছে দেবীর প্রসঙ্গ। একদা পুরাকালে, শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত দেবগণ দেবীর স্তব করেছিলেন। সে সময়ে পার্বতী দেবীর দেহকোষ থেকে অম্বিকা উৎপন্না হন। এ কারণে জগতে তিনি কৌশিকী বলে খ্যাতা। অতঃপর পার্বতী দেবীও কৃষ্ণাবর্ণা হয়ে কালিকা নামে হিমালয়ে অধিষ্ঠান করেন। অতঃপর ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে দেবী কৌশিকীর ললাট থেকে চামুণ্ডা কালীর অবির্ভাব। কেমন সেই দেবী?

"বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।।"

---অর্থাৎ "অম্বিকার ললাটোদ্ভূতা সেই চামুণ্ডা দেবী বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিহিতা, অস্থিচর্ম-মাত্রদেহা, অতিভীষণা, বিশাল-বদনা, লোলজিহ্বায় ভয়প্রদা, কোটরগত-আরক্ত-চক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকট শব্দে দিঙ্মণ্ডল-পূর্ণকারিণী। এই দেবী যুদ্ধকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে তাদের ছিন্ন মস্তকদ্বয় দেবী চণ্ডিকাকে উপহার দিয়েছিলেন। চণ্ডিকাদেবী প্রত্যুত্তরে কালীকে বলেন—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি।।"

অর্থাৎ চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় আনয়নের জন্যই পৃথিবীতে দেবী কালিকা চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত।

দুর্গাপুজোয় মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে যে সন্ধিপূজা হয়, তা তো আসলে এই চামুণ্ডারূপী কালীরই পূজা। সুতরাং এটা খুব স্পষ্ট যে, বেদ বা তন্ত্রের যে ধারার কথাই আমরা আলোচনায় আনি না কেন, তাতে শক্তিসাধনার বা কালীপূজার বিশেষ স্থান রয়েছে। আর শক্তি বলতে এখানে আদ্যাশক্তি মহামায়ার কথাই বলা হচ্ছে। দেবী কালিকা তাঁরই এক রূপ।

এবারে আরও একবার কাহিনির অতলে ডুব দেওয়া যাক। শ্রীধাম নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এ হলো ষোড়শ শতাব্দীর কথা। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। যদিও মত ও পথের দিক থেকে দু'জনের অবস্থান দুই ভিন্ন মেরুতে। সে যাই হোক, কৃষ্ণানন্দ ছিলেন তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ মাতৃসাধক। কিন্তু দীর্ঘদিন মাতৃসাধনা ও মাতৃআরাধনার পরও তাঁর মনে যেন কিছুতেই শান্তি নেই। আসলে, এতদিন মা পূজিতা হচ্ছিলেন নিরাকারা কালীরূপে। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ চাইলেন মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পুজো করতে। কিন্তু কেমন হবে সেই মূর্তি? ভেবে চললেন তিনি। সময় চলতে থাকে আপন খেয়ালে। দিবানিশি জগজ্জননীর কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানান তিনি সাকার রূপে মাকে দেখার বাসনায়। একদিন অমাবস্যার ঘোর নিশীথে শ্মশানে বসে ধ্যান করে চলেছেন কৃষ্ণানন্দ, হঠাৎ দৈবাদেশ পেলেন, জগন্মাতার মাতৃরূপা মূর্তি গড়ে পুজো করার। আর সেই সঙ্গে সুপ্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রকে নিয়ে একটি বই রচনা করবার। এসবই ছিল মহামায়ার লীলা। কৃষ্ণানন্দ ছিলেন নিমিত্তমাত্র। এদিকে কৃষ্ণানন্দ তো ভেবেই আকুল। মায়ের তো অসংখ্য রূপ। কোন রূপটিকে তিনি মূর্তি গড়ে পুজো করলেন। পলকের মধ্যে এই চিন্তা মনে উদয় হতেই তক্ষুণি আবারও দৈববাণী হলো— "কাল ভোরে তুমি যে নারীমূর্তিকে সর্বাগ্রে দেখবে, সেই রূপেই আমি পূজিতা হব।"

রাত শেষে ভোর হয়ে এল। কৃষ্ণানন্দ গঙ্গাস্নানে চলেছেন। এ তার প্রতিদিনের কাজ। আর এই পথেই তিনি রোজই আসেন গঙ্গার ঘাটে। কিন্তু আজ তার মনে উত্তেজনার ঢেউ উঠছে। তিনি কাকে প্রথম দেখবেন! হঠাৎ দেখতে পেলেন অন্ত্যজ বর্ণের একটি মেয়েকে। গায়ের রং ঘোর কালো। তার এক পা মাটিতে, অপর পা দাওয়ার উপর। ডান হাতে একতাল গোবর। হাতটি এমনভাবে তোলা যে মনে হবে বরাভয়দায়িনী। মেয়েটি ঘরের দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। আর বাঁ হাতে বেড়াতে গোবরের প্রলেপ দিচ্ছে। এখানেও ঠিক যেন করুণা বিতরণের ভঙ্গি। মেয়েটির মাথায় একরাশ কালো চুল। আলুলায়িত। পরনে একটি উঁচু করে পরা ছোট্ট শাড়ি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আর পাঁচটা সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মতোই যেন এই বেশ। এদিকে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আচমকা কৃষ্ণানন্দকে দেখে মেয়েটি লজ্জায় জিভ কাটল। কৃষ্ণানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন মায়ের রূপ আর সেই রূপেই মূর্তি গড়ে জগজ্জননীর পুজোর ব্যবস্থাও করলেন। আজ আমরা শ্যামামায়ের যে মূর্তিকে পুজো করে থাকি, তার প্রচারক কৃষ্ণানন্দই। তবে অনেকেই একটা প্রশ্ন করতেই পারেন এই ব্যাপারে। আমরা এখন যে মূর্তির পুজো করি, তা তো দেবীর এক ভয়ংকরী রূপের প্রকাশ। এই দেবী নগ্ন। গলায় মুণ্ডমালা, কোমরের বন্ধনী তৈরি হয়েছে ছিন্ন হাত দিয়ে। কৃষ্ণানন্দ যাকে দেখেছিলেন বা আমরা যে গ্রাম্য মেয়েটির কথা বললাম, সে তো এই রকম কোনো ভয়ংকর রূপের প্রকাশ নয়। আর সে তো নগ্নও নয়। তবে? এই সবের উত্তর লুকিয়ে আছে পুরাণে। তাই এটা বুঝতে

অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, আমরা যে দেবীমূর্তিকে পুজো করি তা নিছকই আগমবাগীশের সৃষ্ট দেবীমূর্তি নয়, এর সঙ্গে নানা পৌরাণিক কাহিনিও সংযুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তো আমরা আগের পরিচ্ছেদেই আলোচনা করেছি।

শাস্ত্রমতে আমাদের এই দেহের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুটি নাড়ি আছে। আর এদের মধ্যে রয়েছে 'সুষুম্না।' এইটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা কিনা মেরুদণ্ডের নামে সংযুক্ত। অধ্যাত্মজগতে এর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। রামপ্রসাদ লিখেছেন—

''ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তারি মধ্যে গাঁথা শ্যামা
ব্রহ্ম সনাতনী।''

আগেই বলেছি কুণ্ডলিনী শক্তির কথা। এই ব্যাপারটা নিয়ে আরও দু'চার কথা। আমাদের দেহমধ্যে মূলাছার চক্রে কুণ্ডলীবদ্ধ অবস্থায় থাকেন এই শক্তি। দেবী কালিকার আশীর্বাদে তাঁর সাধনায় এই শক্তি জাগ্রত হন। প্রসঙ্গত, দেহে চক্রের সংখ্যা ছয়টি। এদের 'ষট্‌চক্র' বলা হয়। এগুলির নাম এইরকম— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধা ও সহস্রার। কুণ্ডলিনীর বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় ও বেগও বিদ্যুতের মতো। এর পরিপূর্ণ বিকাশে দেহ ও মনের সর্বাত্মক বিকাশ ঘটে। জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রসারতা লাভ করা যায়। দেবী কালিকার প্রকৃত সাধক মায়ের নামসুধা পান করতে করতে বিভোর হয়ে যান। একে বলে সমাধি। সিদ্ধ সাধক ওই ষট্‌চক্র ভেদ করে কুণ্ডলিনীকে মূলাধার থেকে সহস্রারে বিরাজমান শিবের সঙ্গে মিলিত করেন। মায়ের আশীর্বাদ ব্যতীত, তাঁর কৃপা ভিন্ন এটি সম্ভব নয়।

বাঙ্গালির মা কালী হলেন শ্যামাকালী। কালীর আরও নানান রূপ আছে। এবার সেই বিষয়ে আলোচনা। কালীর রূপ কয় প্রকার ও কী কী? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আদ্যাশক্তির রূপ সংখ্যা বা রূপবৈচিত্র্য অসীম। অসংখ্য রূপ, অসংখ্য নাম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর এক একটি রূপ অনুযায়ী নামকরণ। কোথাও বা তাঁর নানাবিধ কাজ অনুযায়ী নামকরণ। তোড়লতন্ত্রে এইভাবে বলা হয়েছে—

''দক্ষিণাকালিকা সিদ্ধকালিকা গুহ্যকালিকা
শ্রীকালিকা ভদ্রকালী চামুণ্ডাকালিকা পরা।
শ্মশানকালিকা দেবী মহাকালীতি চাষ্টধা।।''

এই অষ্টকালী হলেন— দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্রীকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও মহাকালী।

আবার জয়দ্রথযামল নামক প্রায় বিরল একটি তন্ত্রগ্রন্থে কালীর আরও কিছু নাম ও রূপের সন্ধান মেলে। যেমন— ঈশানকালিকা, রক্ষাকালী, প্রজ্ঞাকালী, ধনদকালিকা প্রভৃতি।

এইরকম বিভিন্ন প্রচলিত তন্ত্রগ্রন্থে দেবীর বহু নাম ও রূপের সন্ধান মেলে। আবার এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে শুধু নামেরই উল্লেখ আছে। পূজাপদ্ধতি বা রূপের বিশদ বিবরণ খুব একটা পাওয়া যায়নি। এবার কালীর কয়েকটি প্রধান ও অধিক প্রচলিত রূপ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

**১। দক্ষিণাকালী :** বইয়ের গোড়াতেই দেবী কালিকার যে ধ্যানমন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে তা দক্ষিণাকালীরই ধ্যানমন্ত্র। সাধারণত কালীমূর্তি বলতে এই কালীকেই বোঝায়। শ্যামাপূজোয় মূলত এই কালীরই পুজো করা হয়ে থাকে। শিবের বুকের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করেছেন বলে ইনি দক্ষিণাকালী। আবার পুজো-অর্চনা বা যাগ- যজ্ঞের শেষে যেমন দক্ষিণা দেওয়ার রীতি আছে, যা ব্যতীত ক্রিয়াকাণ্ড সফল হয় না, ঠিক সেইরকম দেবীও তাঁর ভক্তকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্বর্গ প্রদান করেন। তাই তিনি দক্ষিণাকালী।

**২। শ্মশানকালী :** আদ্যাশক্তির একটি ভয়ংকর মূর্তি হলো এই শ্মশানকালী। স্বভাবতই ইনি শ্মশানবাসিনী। শব, শিবা পরিবেষ্টিতা হয়ে মা শ্মশানে বিরাজ করেন। এ যেন ভয়ংকর ও সুন্দরের এক অপূর্ব মিলন। তাঁর অঙ্গে শোভিত হচ্ছে বহুবিধ অলংকারাদি। দেবী ত্রিনয়নী ও আলুলায়িত কেশ সমন্বিতা। শুষ্ক মাংস-অস্থি যুক্ত দেহ। তাঁর বাম হস্তে মদ্যপূর্ণ নরকপাল ও দক্ষিণ হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। তিনি সর্বদাই মাংস চর্বণে রতা।

**৩। গুহ্যকালী :** গুহ্যকালী প্রসঙ্গে শাস্ত্রের বচন এখানে উদ্ধৃত করছি—

'...অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে।' যদিও এই পরিচ্ছেদে আমরা কালীর আরও একটি রূপ মহাকালী প্রসঙ্গেও আলোচনা করব, কিন্তু অনেকে গুহ্যকালীকেই মহাকালী নামেও অভিহিতা করেন। গুহ্যকালীর রূপ কেমন? তিনি কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করে আছেন। কোটরাগত চক্ষু। দেবীর মুখে স্মিত হাসি। তিনি লোলজিহ্বা। তাঁর ললাটে শোভিত হচ্ছে অর্ধচন্দ্র। গলদেশে নাগহার শোভিত। সুবৃহৎ তাঁর উদর। এই গুহ্যকালী দেবী সর্বদাই শোণিত পানে উন্মত্তা। তিনি নাগশয্যার উপরে অবস্থান করেন ও নাগরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে আছেন। তাঁর কণ্ঠে পঞ্চাশটি মুণ্ড সমন্বিত বনমালা। আর তাঁর মস্তকে নাগরাজ অনন্ত শোভা পাচ্ছেন। এই দেবীর অলঙ্কার হলো নাগ। তক্ষক তাঁর বাম বাহুর কঙ্কন ও অনন্ত নাগ তাঁর দক্ষিণ বাহুতে কঙ্কনশোভিত। দেবীর কটিদেশে যে কোমরবন্ধ, তাও নাগদ্বারা নির্মিত। দেবীর দুটি হস্ত। তাঁর কুণ্ডল নরদেহ অর্থাৎ শব। এই নবরত্ন বিভূষিতা শিবমোহিনী দেবীকে নারদাদি মুনিরা সেবা ও বন্দনা করছেন। এই গুহ্যকালিকার অর্চনায় সাধকের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে থাকে। বালকবেশী শিব দেবীর বামে অবস্থান করছেন।

**৪। মহাকালী :** এইবার আসা যাক মহাকালীর বর্ণনায়। যোগশাস্ত্র মতে তিনি নিরাকারা। তাই এঁর কোনো মূর্তি হয় না। সৃষ্টির আদিতে যখন জীবজগৎ সৃষ্টি হয়নি, তখন মা নিরাকারা মহাকালী একাকী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। তবে অন্যান্য যে সব রূপ, তা এঁর থেকেই সৃষ্ট। আবার 'দেবীমাহাত্ম্য' বা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে একটু অন্যরকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে এইভাবে বলা হচ্ছে যে, আদ্যাশক্তি যিনি তিনিই মহামায়া। তাঁকেই 'বিষ্ণুমায়া' নামেও স্তব করা হয়ে থাকে। যুগে যুগে যখনই দানবের পদভারে ত্রিভুবন কেঁপে ওঠে, তখনি দেবতারা, মুনি-ঋষিরা সাধারণ মানুষেরাও দেবীর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। দেবী এক-একটি সময়ে

এক একটি রূপে অবতীর্ণা হয়ে থাকেন। এইরকমই তিনটি চরিত্র বা রূপের কথা বলা হয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। এঁরা হলেন যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, মহাকালী হলেন দেবী চণ্ডিকারই একটি রূপ।

'ওঁ খড়্গাং চক্র গদেষুপপরিখান্ শূলং ভুষণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুংকৈটভম্।।'

অর্থাৎ যিনি দশহস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তির, ধনু, লণ্ডড়, শূল ভুষণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন; যিনি সর্বপ্রকার অলংকারে সুশোভিতা (বা যাঁহার সর্বাঙ্গ অলংকারে আবৃত) এবং নীলকান্ত মণিতুল্য প্রভাবিশিষ্টা; যাঁর দশটি মুখ ও দশটি পদ, বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত হলে মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিনাশের জন্য ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেছিলেন, আমি সেই মহাকালীর ধ্যান করি।" দেবীর কাছে আমাদের তো এইটাই চাওয়া। সামগ্রিক মঙ্গল যেন হয় আমাদের। এ জীবনে যেন আমরা তাঁর কৃপায় চৈতন্যলাভ করতে পারি।

তত্ত্ব আলোচনা থেকে ফিরে আসি তথ্যের কথায়। এর আগে আমরা দেবী কালিকার বিভিন্ন রূপ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এবার কালীর পুজো প্রসঙ্গে আরও দু'চার কথা। বলা হয় যে, কালীর পুজোয় শুধুমাত্র দীক্ষিতেরই অধিকার। অন্য কারো নয়। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত না হলে এই পুজোর অধিকারী হওয়া যায় না। তাহলে কি মায়ের পুজো, তাঁর আরাধনা সন্তান করবে না! এর উত্তরও আছে। ভক্তিই সকলের সার। তাই ভক্তিসম্বল করে ভক্তবৎসলা মায়ের পুজো তো সন্তান করতেই পারে। মা তো পরম করুণাময়ী।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, যে স্থানে দেবীর নিত্যপুজো হয়ে থাকে, সেখানে দেবীমূর্তি স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা করা হয় মন্দিরে, অন্যদিকে বিশেষপুজো ইত্যাদি করা হয়ে থাকে অন্যত্র, যেমন কোনো কাঁচা মন্দির বা গাছতলায় ইত্যাদি স্থানে। প্রাচীনকাল থেকেই বছরের নানা সময়ে শহরে, গ্রামে সর্বত্রই কালীপুজো হয়ে আসছে। যেমন দুর্গাপুজোর পরের অর্থাৎ মহালয়ার পরবর্তী প্রথম অমাবস্যায় শ্যামাপুজো তো এই বঙ্গপ্রদেশে ঘটা করেই পালিত হয়। আবার, মাঘের অমাবস্যায় রটন্তী কালীর পুজো কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী কালীপুজোও তো সর্বজনবিদিত। এছাড়াও শনি-মঙ্গলবারে মায়ের বিশেষ পুজো তো আছেই।

আবার মহানির্বাণতন্ত্রে কী সুন্দরভাবে কালীর কথা রয়েছে। এতে বলা হচ্ছে যে—

"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালং প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।।
কাল সংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে।।
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে।।"

অর্থাৎ "প্রাণীমাত্রকে সংহার করেন বলে তিনি মহাকাল, তাঁকে তুমি কলন কর। (সংহার কর), এজন্য তোমার নাম আদ্যা, পরা, কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর। এই জন্য তুমি কালী। সর্বকালত্ব ও সর্বাদিত্বহেতু তুমি আদ্যা কালী। মহাপ্রলয়ের পর পুনর্বার স্বরূপ অবলম্বন করে তমোরূপে আকারহীন অবস্থান বাক্য-মনের অগোচর হয়ো তুমি একাই বর্তমান থাক।"

কালীতত্ত্ব অসীম ও অপার। তাই সীমিত পরিসরে এই আলোচনা সম্ভব নয়। তবু যতদূর আলোচনার চেষ্টা করা হলো এই প্রবন্ধে। বর্তমান অতিমারীর অবস্থা থেকে দেবী যত দ্রুত সম্ভব পৃথিবীকে মুক্ত করুন— এই কামনাই করা উচিত। দেবী কালিকা সকলের কল্যাণ করুন— এটাই কাম্য।

'কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণী।
ধর্মার্থ মোক্ষ্যদ দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।'

*(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)*

*With Best Compliments from :*

**Singhania & Co.**

7B, Kiransankar Roy Road
2nd Floor, Kolkata - 1

# কালীসাধিকা নিবেদিতা

**সারদা সরকার**

ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা। মার্গারেট নোবেলকে দ্বিতীয় জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর গুরু, তাঁর রাজা। জন্মদাতাকে পিতা ছাড়া কী বলা যায়? সুদূর আয়ার্ল্যান্ডের এক গোঁড়া ধর্মযাজকের ঘরে জন্মে জেনেছিলেন প্রশ্ন করতে নেই। অথচ তাঁর মনে প্রশ্ন উথালপাথাল করত। ইচ্ছে করত প্রশ্নে প্রশ্নে দুনিয়াটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে। কিন্তু উত্তর কে দেবে? তাঁর পিতা ধর্মযাজক স্যামুয়েল নোবেল বলেছিলেন যে একদিন ডাক আসবে ঠিক। সেদিন সে পৃথিবীর ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়বে অনেক বড়ো কাজে। সেই ডাক তিনি পেয়েছিলেন। যেন জানাই ছিল যে তাঁর উম্বলডনের স্কুল, লন্ডনের বিলাসবহুল জীবন আর কোনো কাজে আসবে না, ভরে উঠবেন ভারতের ভালোবাসায়। স্বামীজীর ব্রতপালনে, সারদা মা'র অপাপবিদ্ধ স্নেহের টানে, বাগাবাজারের অন্ধগলি, গঙ্গার গেরুয়া রং তাঁর জীবনজুড়ে এঁকে দেবে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম। নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ— এই হবে তাঁর পরিচয়। গুরু তাঁকে পথ দেখিয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে। ধ্যানে নিমগ্ন স্বামীজীকে দেখলে রাজরাজেশ্বর স্বয়ং শিবের কথাই মনে আসে। এক আদর্শ পুরুষকার যিনি একাধারে প্রভু, পিতা, অধ্যক্ষ, যিনি সর্বদা পুরোভাগে থাকেন, তাঁর সন্তানদের কেশাগ্র স্পর্শের অধিকারও কারুর থাকে না। তিনি প্রতিটি জীবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার নিজে বহন করেন। ভালোবাসায়, নিয়মানুবর্তিতায় এবং শক্তিতে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম, পরম শক্তিমান পরমপুরুষ। সেই বিবেকানন্দকে বুঝি সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন নিবেদিতা।

এই স্বামীজীই তাঁকে চিনিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মকে, তার তেত্রিশকোটি দেবদেবীকে। বহুত্ববাদী হিন্দুধর্মে জড় অজড় এমনকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে যে সেই পরমব্রহ্মকে দেখা যায়— সেটি শিখিয়েছিলেন। চিনিয়েছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভোলা মহেশ্বরকে। তাই নিয়েই নিবেদিতার রচনা 'কালী দ্য মাদার'। দেবাদিদেব মহেশ্বর এখানে ভিখারি। তাঁর সর্ব অঙ্গে চিতাভস্ম, শীত গ্রীষ্মের বোধ নেই, মাথায় প্রকাণ্ড জটাজুট, নীরব নিশ্চল এবং ধ্যানে আত্মহারা। অর্ধনীমিলিত নয়নে তিনি যেন জগতের দুঃখদুর্দশার কোনো খবরই রাখেন না। কিন্তু ভ্রূমধ্যে তৃতীয় নয়নে তিনি বিশ্বচরাচরে প্রতিটি তৃণগুল্ম সাকার নিরাকার জড় ও জীবের পরিত্রাতা। মন্থনজাত বিষে তাঁর কণ্ঠ নীল। তিনি স্বয়ম্ভু নিঃস্ব রিক্ত। বাঘছাল ও রুদ্রাক্ষ ছাড়া তার বসন ভূষণও কিছু নেই। গঙ্গাজলে এবং সামান্য বেলপাতায় তুষ্ট তিনি। করুণাময় মহাদেব ধ্বংসের দেবতা কিন্তু সেই ধ্বংস কেবলমাত্র অজ্ঞানতার বিনাশ। সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু প্রার্থনা তাঁর কাছে— অসৎ হইতে মোরে লয়ে চল সতে/আলোকে লইয়া চল আঁধার হইতে/ অমৃতে মিলাও নাথ নাশিয়া মরণ, জ্যোতির্ময় দয়া করি দাও দরশন। তাঁর গুরুর সঙ্গে এক নিশ্চিত আধ্যাত্মিক বন্ধন তাঁকে নিয়ে যায় এক অসীমলোকে, যেখানে প্রতি জীবাত্মার মিলন হয় পরমাত্মা মহাশিবের সঙ্গে। এহেন শিব যাঁর পদতলে, সেই মহাকালিকার সঙ্গেও পরিচয় করিয়েছিলেন স্বামীজীই। সেই কালী যিনি মহাদেবের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছেন। যেন তাঁর মৃত্যুরূপা নৃত্যের তালভঙ্গ

হয়েছে কোথাও। চারিদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে ধ্বংসের চিহ্ন। নরমুণ্ডের মালা কণ্ঠে ধারণ করেছেন। হাতের খড়্গে এখনও রক্ত লেগে রয়েছে, হাতে ধরা নরমুণ্ড থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। হঠাৎ স্বামীর বুকের ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ে গ্রাম্য মেয়েদের মতোই একরাশ অবাক লজ্জায় মা জিভ কেটেছেন। তাঁর ডান হাতে বরাভয় মুদ্রা তবু তিনি দিগম্বরী ভয়ংকরী কৃষ্ণবর্ণা। তাঁর একঢাল কালো চুল আকাশজুড়ে ঝড় তুলেছে। সেই দুরন্ত দুর্মদ মূর্তি দেখে পদতলে দলিত শিব একটুও ভয় পাননি বরং সেই রুদ্রাণীকে মা বলে ডেকেছেন। এ যেন জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন।

নিবেদিতাকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হতো না। বিদেশিনীর মন্দির প্রবেশের অধিকার ছিল না। নিবেদিতা তো দূরের কথা, গোঁড়া হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা স্বামীজীকেও কালাপানি পার হবার অপরাধে ঢুকতে দেননি। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শ্রেষ্ঠ শিষ্য জগতজয়ী বিবেকানন্দ। তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, নিবেদিতা তো কোন ছার। নিবেদিতার কাছে পড়েছেন এমন স্কুলের এক ছাত্রী পরবর্তীকালে লিখেছেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হতো, নিবেদিতাই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, ছাত্রীদের ঢুকতে দেওয়া হলেও নিবেদতা দূরে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন। শিশুমনে প্রশ্ন আসত নিবেদিতাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না কেন? মা ভবতারিণীর চোখও কি ভিজে উঠেছিল সেদিন? নিবেদিতার মনে পড়ে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন গুরুকে, আপনি মা কালীকে বিশ্বাস করেন? জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্বামীজী বলেছিলেন, 'মার্গো, কালীকে ঘৃণা করতাম, কালীর সব কিছুই আমার অপাংক্তেয় বলে মনে হতো। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে আমার এই লড়াই জারি ছিল। কিন্তু শেষে আমাকেও মেনে নিতে হয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভালোবাসতাম, তাঁর নির্মল সরল ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, আবিষ্ট করেছিল। ভাবতাম সবসময় এই কালী দর্শন এক মস্তিষ্কবিকারের লক্ষণ। কিন্তু তারপর এমন একদিন এল যখন আমার বলে আর কিছু রইল না, সবটুকু তাঁকে সমর্পণ করে দিলাম। সেদিন মা কালীও আমার হয়ে গেলেন।

স্বামীজী বলেছিলেন সেদিনের সেই ঘটনা। গুরু শিষ্যের কথোপকথন কে না জানে? ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে নরেন? কী হয়েছে বাবা?'

'চাকরি নেই, বাবার মৃত্যুর পর ছোটো ছোটো ভাই-বোনদের মুখে অন্ন তুলে দিই এমন সংস্থান নেই। মা তো আপনার কথা শোনে, বলুন না আমাকে একটা চাকরি করে দিতে?'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'যা যা আজ যে মঙ্গলবার, মায়ের বড়ো প্রিয় দিন, মা-কে গিয়ে বল চাকরির কথা, মা তোর কথা ফেলতে পারবে না রে। রোজ রোজ মা-কে বলি মা নরেনকে দেখো সব দাও ওকে, মা আমার কথা শোনে না! তুই যে মা' কে মানিস না। একবার বিশ্বাস করে যা না নরেন।'

স্বামীজীর ওপরে সেদিন যেন কী ভর করেছিল, উন্মত্তের মতো বিবশ হয়ে মন্দিরে গেলেন সেদিন, মঙ্গলবার রাত ন'টা বাজে ঘড়িতে। মহাকাশ জুড়ে তারারা জ্বলে উঠেছিল আনন্দে। জগৎ জুড়ে বেজেছিল অধ্যাত্মতরঙ্গ। ঐতিহাসিক ঘটনার মুখোমুখি মহাপৃথিবী। গর্ভগৃহে মা আর নরেন সামনাসামনি। স্বামীজী দেখেছিলেন চিন্ময়ী মা-কে, করুণাধারার বন্যা বইছে মায়ের দুচোখ দিয়ে। জ্ঞানস্বরূপা ব্রহ্মময়ী, অপরিসীম স্নেহ আর সৌন্দর্য দিয়ে আগলে রেখেছেন সন্তানকে। এই মায়ের কাছে চাকরি চাওয়ার কথা কি কারুর মায়ায় আসে? চাইলেন বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিবেক, ভক্তি... তারপর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ কালী-কে নিয়েই কেটেছে স্বামীজীর।

স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'এমনই ঘটনা ঘটেছিল ক্ষীরভবানীতে। শ্রীনগরে। মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে বড়ো কষ্ট হয়। মুসলমান লুণ্ঠনকারীর আক্রমণে মায়ের এমন দশা, আমি যদি থাকতাম তাহলে এমনটা কিছুতেই হতে দিতাম না'। দৈববাণী হয়েছিল মাতৃকণ্ঠে, মা বলছেন, আমি চাইলে এখানে কি সাতমহলা সোনার মন্দির বানিয়ে নিতে পারতাম না? 'সেদিন থেকে আমি আর কোনো কাজ করব এরকম ভাবি না। মায়ের ইচ্ছে হলে মা নিজেই সেটা করিয়ে নেবেন। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎ কৃপা ত্বমহংবন্দে পরমানন্দ মাধবম্।'

নিবেদিতার কাছে কালী একদিকে রক্তপিপাসু, অন্ধকারের দেবী, মুণ্ডমালিনী আবার অন্যদিকে ভালোবাসার নির্ঝরিণী, পরম স্নেহময়ী, সমস্ত জীবের ক্ষুধাস্বরূপা। এই কালী দ্য মাদার নিবেদিতাকে ভাবিয়েছিল, ভরিয়েছিল। নিবেদিতার কাছে কালীমূর্তি সতত চলমান, অন্য দেবদেবীদের মতো বসে বা দাঁড়িয়ে নেই। নারীসুলভ পেলবতা হারিয়ে তাঁর রক্তজিহ্বা লেলিহান অগ্নিশিখার মতো বহ্নিমান। কাল অর্থাৎ সময়কে কলন করেন বলে তাঁর নাম কালী, সময় যেমন চলমান, কালীও তেমনই চলমান। সময় সব ভক্ষণ করে নেয়, কালীও তাই ক্ষুধাতুরা। কালীর এক পদক্ষেপে যেমন কোটি বিশ্ব ধ্বংস হয়। অনন্তপথে তাঁর চিরদিনের আনাগোনা। সৃষ্টি এবং সংহার দুইয়ের মেলবন্ধনেই তিনি ভবতারিণী বিশ্বজননী। রক্তবীজ ধ্বংসের সময় যখন একফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ে জন্মায় লক্ষ কোটি বক্তবীজ, তখন মা কালী সেই রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই পান করে নেন। হাজার হাজার রক্তবীজ ধ্বংস হয় এভাবেই। রক্ত শব্দের উৎপত্তি অনুরক্ত থেকে অর্থাৎ আসক্তি। মা কালী এই আসক্তিই ছিন্ন করেন। একদিকে বন্ধন ছিন্ন করেন ছিন্নমস্তা হয়ে আবার আরেক দিকে অভয়ামুদ্রায় বুকে জড়িয়ে নেন সন্তানকে। কথিত আছে ক্রমাগত রক্তপানে উন্মত্তা কালিকা যখন প্রলয়নাচন শুরু করেন, তাঁকে থামাতে মহাকাল তখন তাঁর নৃত্যপথে শুয়ে পড়েন। কিন্তু তাতে কালীর পথচলা কি বন্ধ হয়? দিক অম্বর যার অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার পরিধেয় বসন,সেই নগ্নিকা দেবীই হয়ে ওঠেন সকলের মা, সত্যিকারের মা, মুখের কথার মা নয়, পাতানো মা নয়, মা সারদা, জননী কালী। যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন পূজা করেছিলেন। অহংকার চূর্ণ করে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে যে শিশু, মা কালী তাঁকে গলার মালা করে রাখেন। কিন্তু নিমগ্না রক্তনয়নার পথ চলা ফুরোয়না। নিবেদিতার কালী দ্য মাদার মিলেমিশে যায় সঙ্ঘজননী মা সারদার রূপের অরূপ বিভায়।

■

# ভগিনী নিবেদিতার কালী চিন্তন

**সুতপা বসাক ভড়**

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগিনী নিবেদিতার লেখা 'কালী দি মাদার' পুস্তকটির প্রভাব ছিল অপরিসীম। এটি ছিল বিশেষভাবে বিপ্লবীদেরই মন্ত্রপুস্তক। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যখন বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি— মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন তিনি এই বইটি পড়েন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'I was very much enamoured at the time (when in Baroda) of her book,–Kali the Mother.' আবার লিখছেন, 'I had read and admired her book Kali the Mother.'

আপাতদৃষ্টিতে 'কালী দি মাদার' বইটি কালীপূজা সম্পর্কে উচ্চ কাব্যিক এবং দার্শনিক বিশ্লেষণ। গীতা নিষ্কাম কর্মবাদের সাহায্যে বিপ্লবীদের প্রেরণা জাগিয়েছে। তেমনি কালী দর্শনের মধ্যে 'মৃত্যুদর্শন' ছিল বিপ্লবীদের কাছে উদ্দীপনার উৎস। এই দর্শন তিনি শিখেছিলেন স্বামীজীর কাছে এবং তা ছড়িয়ে দেন বিপ্লবীদের মধ্যে। নিবেদিতার স্বীকারোক্তি অনুসারে 'কালী' পুস্তকের 'ভয়েস অব দি মাদার' পর্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি সংকলন। এরই কিছু অংশের অনুবাদ দেওয়া হলো :

'ওঠো বৎস, জাগো। বেরিয়ে পড়ো বীরের মতো। বহন করো দায় পুরুষের মতো। করণীয় কাজ সমাধা করো পূর্ণ শক্তিতে, নির্ভয়ে। ভুলোনা— আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমাদের মাতা।'

'জীবন বিমর্ষ কিছু নয়। নিয়তি তোমার মায়ের খেলা ছাড়া আর কী! এসো, আমার সঙ্গে খেলো খানিক। যাই ঘটুক, স্ফূর্তিতে তার মুখোমুখি হও।'

'অভ্রান্ত আমার খেলা। এ খেলায় যোগ দিতে নিজের যাত্রা শুরু করো। ভেবে নাও— আমার খুশির জন্য এ-পৃথিবীতে তুমি এসেছে। যখন রাত্রি ঘনাবে, চরিতার্থ হবে আমার আকাঙ্ক্ষা, তখন তারই খুশির টানে তোমাকে ফিরিয়ে নেব আমারই বিশ্রামে। প্রশ্ন করো না, সন্ধান করো না; পরিকল্পনা করো না, আমার ইচ্ছা প্রবাহিত হোক তোমার মধ্যে— যেমন শঙ্খের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্র।'

'এইটুকু কেবল বুঝে নাও— কোনো পদক্ষেপ ব্যর্থ হবে না, একটি চেষ্টাও বিফলে যাবে না পরিণতিতে। কর্ম থেকে অল্প হোক স্বপ্ন। এখানে-ওখানে তুচ্ছ কারণে ঘুরবে-ফিরবে তুমি, কিন্তু তোমার সকল যাতায়াত শেষ পর্যন্ত বিরাট পরিণতির সহায়ক হবে। তুমি অনেকের সাক্ষাৎ পাবে, কথাও বলবে তাদের সঙ্গে, কিন্তু জেনো, কেবল কয়েকজনই শুরু থেকে আমার, তাদের সঙ্গে গোপন সংকেত বিনিময় করবে, আর তারা অনুসরণ করবে তোমাকে।'

'কী সে সংকেত?'

'যারা আমার— তাদের হৃদয়ে ঝলসায় কালীর বলিদানের খড়্গ। মাতার খড়্গ-অবতারের তারা আজন্ম উপাসক, তারা মৃত্যুপ্রেমিক- জীবনলুব্ধ নয়, তারা ভালোবাসে ঝড়-ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তারা আসবে তোমার কাছে না-জ্বলা মশাল নিয়ে— আগুনের জন্য। উপচীয়মান পৃথিবীর উপর দিয়ে আমার কণ্ঠ ডাক দিয়ে ফিরছে জীবনের জন্য— নরপতিগণের প্রাণ ও রক্তের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে। মনে রেখো, আমি যে চিৎকার করে ডাকছি, সেই ডাকে উত্তর কী করে দিতে হয় তাও দেখিয়ে দিয়েছি। এইটুকু জেনো, সর্বক্ষেত্রে মা-ই সর্বপ্রথম মৃত্যুতে ঝাঁপ দেন তাঁর সন্তানদের রক্ষার জন্য।'

'ধর্মকে যে নামই দেওয়া হোক, তা চিরদিনই মৃত্যুপ্রেম, তার মধ্যে আজ বিশেষভাবে সেইদিন এসেছে যখন আমার হাতে জ্বলছে ত্যাগের আগুন, যা মানুষকে বিচারবুদ্ধি থেকে ছিঁড়ে এনে দগ্ধ করবে দারুণ বাসনায়। আমার চিহ্নিত মানুষেরা এখন ঝাঁপ দেবে ত্যাগে, যেমন অন্য মানুষেরা ছুটছে ভোগে। শ্রম, সেবা, পীড়ন, যন্ত্রণাকে এখন মিষ্ট লাগবে— তিক্ত নয়। মহাকালের বুকে মহান এই লগ্ন— এখন, আমি মহাকালী, সেই আমিও জাতিসমূহের জননী।'

'সংকুচিত হয়ো না পরাজয়ে, আলিঙ্গন করো নৈরাশ্যকে, সুখের থেকে ভিন্ন নয় যন্ত্রণা— যখন উভয়কে চাই আমি। অশ্রুর

জগতে এসে তাই আনন্দ করো, আর দেখো, আমি হাসছি। মানুষের সঙ্গে ওখানেই আমার মিলনকুঞ্জ— ওখানেই হৃদয়ের গভীরে আমি তাদের টেনে নিই।'

'আমার বিরোধী স্বার্থের শিকড় উপড়ে ফেলো। আমি যখন কথা বলব তখন প্রেম, বন্ধুত্ব, সুখ, আশ্রয়— কোনো কিছুর স্বর যেন শোনা না যায়। প্রাসাদ ছেড়ে এসে ভয়ানকের সমুদ্রে নিমজ্জিত হও। বিলাসের কক্ষ ছেড়ে এসে জ্বলন্ত নগরীর প্রহরী হও। এই জানো যে, একটির মতো অন্যটিও মায়া। নিয়তির সামনে দাঁড়াও সাহাস্য মুখে।'

'নিজের জন্য করুণা চেয়ো না। তোমাকে আমি অপরের জন্য করুণাবারি বহনের আধার করে তুলব। সাহসের সঙ্গে মেনে নাও নিজের অন্ধকারকে, আর তোমার প্রদীপ উৎফুল্ল করুক বহুজনকে। নিম্নতম কাজ করো সানন্দে, উচ্চপদ ত্যাগ করো অনাকাঙ্ক্ষায়।'

'যে কঠোর কাজে তোমাকে নিয়োগ করেছি, খাড়া থাকো তাতে। বয়নের কাজ করো সযত্নে। তোমার কাছে দাবি করা হয়েছে— সে দাবির পূরণে পিছু হটো না। ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে যাও, পুরস্কারের প্রত্যাশা রেখো না। কঠিন নির্ভয় প্রতিজ্ঞায় স্থির— তুমি।'

'সূর্য যখন অস্ত যাবে, খেলা যখন সাঙ্গ হবে, তখন তুমি অবশ্যই জানবে, হে বৎস আমার— আমি কালী, আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমাদেরই মাতা।'

*(ভগিনী নিবেদিতার লেখা 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের অনূদিত অংশের সংকলন)*

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
**AXIS Bank Ltd.**
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**


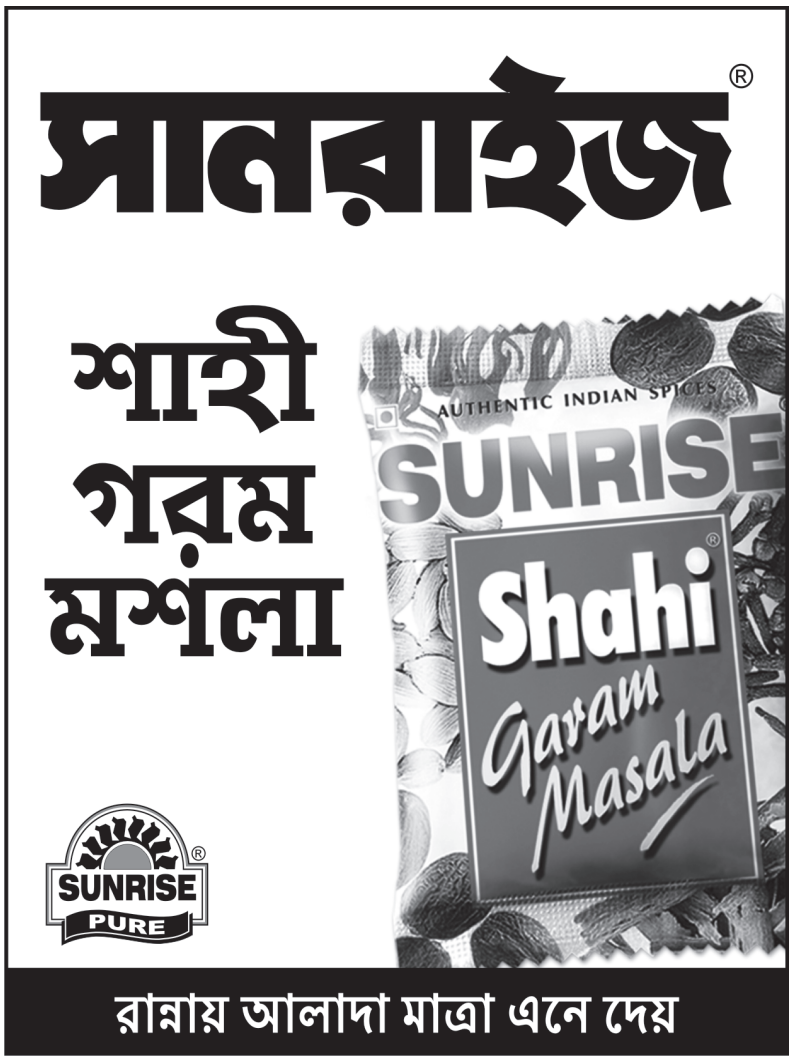

# কলকাতার বারোয়ারি কালীপূজা

**অভিমন্যু গুহ**

বাঙ্গালি সম্বন্ধে প্রচলিত কৌতুক হলো, বাঙ্গালি বিদেশ-বিভূঁইয়ে যে দেশেই যাক না কেন, আর কিছু পারুক না পারুক, একটা না একটা কালীমন্দির সে প্রতিষ্ঠা করে আপন কীর্তি স্থাপন করবেই। তা কথাটা খুব একটা মিথ্যেও নয়। বিদেশেই যখন এই, নিজের দেশ বঙ্গদেশেও তার উদাহরণ কম নেই।

কলকাতার বারোয়ারি কালীপুজোর ইতিহাসে প্রাচীনতম পুজো কোনটা তা নিয়ে একটু ধন্দ রয়েছে। ১৯১৫ সালে অর্থাৎ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা প্রথম ভবানীপুরে বারোয়ারি দুর্গাপূজার সূচনা করার পাঁচ বছর বাদে চেতলা ২৪ পল্লী কলকাতায় প্রথম বারোয়ারি কালীপূজার সূচনা করে। তবে ঠিক দীপান্বিতা কালীপূজা নয়, দশমহাবিদ্যার অর্থাৎ দেবী কালিকার দশরূপের যেমন ছিন্নমস্তা, দক্ষিণা কালী, আদি কালী ইত্যাদি পৃথক দশটি মূর্তির পূজা করা হয় সেখানে। দীপান্বিতা কালীপূজার দিনই নিয়মমাফিক শ্যামাপূজা হয়, ওইদিন কুমারীপূজাও হয়। ছটপূজার দিন বাকি মূর্তিগুলো পূজা পায়। এরপরেই উল্লেখ করতে হয় পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির কালীপূজার কথা। সাবেক নিয়ম ধরলে এই কালীপূজাই কলকাতার প্রাচীনতম বারোয়ারি কালীপূজা। এখানে কালীমূর্তির বিশেষত্ব এর সুবিশাল উচ্চতায়। এর ঐতিহ্যে মিশে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। সাধারণ লোকের কাছে এখানকার পূজিতা কালী 'বড়কালী' নামে পরিচিত, সম্ভবত মৃন্ময়ী মূর্তির আকৃতি দেখেই এরকম নামকরণ। ত্রিশ ফুটের বিশাল প্রতিমা, মায়ের খাঁড়াটিও সেই অনুযায়ী বিশাল মাপের। সাইজে ৬ ফুট, ২২ কেজি রুপো দিয়ে নির্মিত। রুপোর খাঁড়া দান করেছিলেন রণেন পোদ্দার। ১৯২৮ সালে এই কালীপূজার সূচনা হয়। এবারে তাদের কালীপূজা ৯৩ বছরে পড়বে। শুরুর দিন থেকে যে প্রথামাফিক পূজা শুরু হয়েছিল, আজও সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত রয়েছে। যেমন মায়ের সারা গায়ে সোনারুপোর গয়না, বিসর্জনের দিন পুরুষদের ধুতি পরা, মেয়েরা লাল পেড়ে শাড়ি পরে খালি পায়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া— এই প্রথাগুলো পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির পূজা উদ্যোগতারা ধরে রেখেছেন। পূজার পরদিন অন্নকূট উৎসবের সমারোহও আগের মতোই বহাল। কয়েক হাজার মানুষকে সেদিন ভোগ খাওয়ানো হয়। মা কালীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় ছাপান্ন রকমের ভোগ।

এখানকার পূজার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মানে বাঘাযতীন। যদিও ১৯২৮ সালে যখন ব্যায়াম সমিতির কর্মকর্তারা কালীপূজার সূচনা করেন। তার এক যুগেরও বেশি সময় আগে বালেশ্বরের যুদ্ধে বাঘা যতীন আত্মহুতি দিয়েছেন। তাই ব্যায়াম সমিতির কালীপূজার সঙ্গে তাঁর নাম হয়তো সরাসরি জড়িত নয়। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল এই কালীপূজার সঙ্গে। তিনি পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির সভাপতি ছিলেন ১৯২৯ সাল থেকে ৩১ সাল পর্যন্ত। শোনা যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দায়িত্ব নিয়ে পূজার কাজ সামলেছেন। এছাড়া তৎকালীন সময়ের বহু নামি রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এই পূজার সঙ্গে।

কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ছিলেন একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক। আজ পরিবেশ-পরিস্থিতির বদল ঘটলেও সাবেকিয়ানা আর ঐতিহ্যের মিশেলে পাথুরেঘাটার বড়কালী পূজার আকর্ষণ কলকাতাবাসীর কাছে আগের মতোই আছে।

তবে একই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে বউবাজার অঞ্চলে 'আদি বারোয়ারি কালী পূজা'র কথা। ১৮৫৮ সালে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিহারীলাল বসু তাঁর বাড়িতে এই পূজার সূচনা করেন। পরে ১৯২৪ সাল নাগাদ বসু বাড়ির বংশধরদের পক্ষে শ্যামাপূজার ব্যয়ভার আর বহন করা সম্ভবপর হচ্ছিল না বলে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে এই পূজা চালু রাখেন। ফলে বিহারীলাল বসুর বাড়ির কালীপূজা কালক্রমে 'আদি বারোয়ারি কালীপূজা'র মাধ্যমে বারোয়ারি পূজায় পর্যবসিত হয়। বিহারীলাল বসুর কালীপূজা কলকাতার অন্যতম প্রাচীন কালীপূজা এবং 'আদি বারোয়ারি কালীপূজা'ও কলকাতার অন্যতম প্রাচীন বারোয়ারি কালীপূজার মধ্যে গণ্য।

তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মধ্য কলকাতার কংগ্রেসি নেতাদের দাপটে বারোয়ারি কালীপূজাগুলি অন্য মাত্রা লাভ করে। এ ব্যাপারে কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও সোমেন মিত্রের পূজার কথা বলাই যায়। দুটো পূজাই রামমোহন সরণি চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এখন আর এঁদের কেউই জীবিত নেই। ১৯৫৭ সালে কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ওরফে ফাটাকেষ্টর পূজা শুরু হয়। সোমেন মিত্রের নামে পূজাটির সূচনাকাল ১৯৪১ সাল নাগাদ হলেও তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর জড়িত ছিলেন এই পূজাটির সঙ্গে। এমনকী গত বছরেও যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন পূজায়।

এঁদের সমান না হলেও একসময় নামডাক ছিল জগাদার কালীপূজার। জগাদা ওরফে জগদীশ মিত্র কলকাতার পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর ছিলেন, মহম্মদ আলি পার্কের এই পূজা পঞ্চাশ বছর পার করেও যাও-বা অস্তিত্ব বজায় রেখেছে কিন্তু উদ্যোগতার অভাবে বাঙ্গালির গর্বের, বাঙ্গালি হিন্দুর রক্ষক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অর্থাৎ গোপাল পাঁঠার মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে বারোয়ারি কালীপূজাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরকম অনেক বারোয়ারি কালীপূজাই বন্ধ হয়েছে। ভবিষ্যতেও কিছু বন্ধ হবে আবার নতুন পূজাও চালু হবে। এভাবেই ঐতিহ্য আর আধুনিকতা বারোয়ারি কালীপূজাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। □


বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

# আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণে সমগ্র দেশবাসীর সহযোগিতা কাম্য : মোহনরাও ভাগবত

**স্বয়ংসেবকরা অন্তরিকভাবে, নিঃস্বার্থভাবে এবং নিবেদিত প্রাণ হয়ে এই লক্ষ্য উপলব্ধি করার কাজ করে চলেছে। পুনর্গঠনের এই অভিযানে আপনারা সবাই তাদের সঙ্গে হাত লাগান— এই আমার আন্তরিক আহ্বান।**

আমরা সবাই জানি যে এবছর গত বছরের তুলনায় কম সংখ্যক স্থানে বিজয়া দশমী উৎসব আয়োজিত হচ্ছে। এর কারণ আমাদের সবার অবগত। করোনা অতিমারীর গোষ্ঠী সংক্রমণ রোধ করার জন্য যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে রাশ টানা হয়েছে।

বিগত মার্চ মাস থেকে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে ছাপিয়ে গেছে করোনা-সম্পর্কিত আলোচনা। অথচ গত বছরের বিজয়া দশমী থেকে এবছরের এই অনুষ্ঠান পর্যন্ত সময়কালে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। প্রয়োজনীয় সংসদীয় রীতি অনুসরণ করে ২০১৯-এর বিজয়া দশমীর আগেই সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করা হয়েছে। দীপাবলীর পর মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট শ্রীরাম জন্মভূমি মামলায় সুস্পষ্ট ও ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছেন। ভারতের জনগণ এই ঐতিহাসিক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং ৫ আগস্ট অযোধ্যায় নির্মীয়মাণ শ্রীরাম মন্দিরের ভূমিপূজন ও শিলান্যাসের দিন দেশব্যাপী আনন্দঘন অথচ স্বনিয়ন্ত্রিত, সাত্ত্বিক এবং আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই সংসদে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেশী কিছু দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদভাবের শিকার হয়ে আমাদের যেসব বিপন্ন ভাই-বোন, আত্মীয়, বন্ধু এদেশে আশ্রয়ের জন্য আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যই এই আইন। ওইসব দেশে ধর্মীয় কারণে সংখ্যালঘুদের ওপর অবিচারের ইতিহাস আছে। 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন' কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। বিদেশিদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের যে আইন তা যথাপূর্ব থাকবে। কিন্তু যারা অকারণে এই নতুন আইনের বিরোধিতা করছে তারা মিথ্যা প্রচার করে আমাদের মুসলমান ভাইদের এই বলে বিভ্রান্ত করছে যে এই আইন দ্বারা তাদের

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এই স্পর্শকাতর বিষয়ের সুযোগ নিয়ে প্রতিবাদের নামে সংগঠিত হিংসা ও সামাজিক অস্থিরতা ছড়িয়ে দিতে সক্রিয়। ফলস্বরূপ, আইন পাশের পর দেশে এমন একটা উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যা আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিপন্ন করে ফেলেছিল। ওই উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হতে না হতেই করোনা অতিমারীর প্রকোপ শুরু হয়ে গেল। সাময়িকভাবে অন্য আলোচনা চাপা পড়ে গেল। এই অবস্থাতেও দাঙ্গাবাজ ও সুযোগসন্ধানীদের হিংসা-বিভেদ নতুন করে ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু গণমাধ্যমে করোনার ব্যাপক আলোচনার মধ্যে এসব বিষয় এখন আর শিরোনামে আসছে না বা মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে চলে গেছে।

সারা বিশ্বজুড়েই প্রায় একরকম পরিস্থিতি। তুলনামূলকভাবে আমাদের ভারত অনেক বেশি দৃঢ়তা ও দক্ষতা সহকারে অতিমারীজনিত বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। ভারতে এই করোনা অতিমারীর মারাত্মক প্রভাব পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় কম হওয়ার কিছু নির্দিষ্ট কারণ আছে। আমাদের সরকারি এবং সমস্ত প্রশাসনিক সংস্থাগুলো খুব দ্রুত এই অতিমারীর মোকাবিলায় তৎপর হয়ে ওঠে। তারা জনগণকে সজাগ করে দেয়, কীভাবে সাবধানে থাকা যাবে সে বিষয়ে জানিয়ে দেয় এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে দল গঠন করে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু করে দেয়। আর আমাদের গণমাধ্যমের একাংশ একটানা শুধু করোনা নিয়ে খবর করে গেছে। এর ফলে হয়তো জনগণের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ভীতির সঞ্চার হয়েছে আবার মানুষ বাধ্য হয়েছে সাবধানতা, সংযম ও আইন মেনে চলতে। সরকারি আধিকারিকরা, বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা দেন সেই চিকিৎসকরা, পুলিশ আধিকারিক, পৌরসভার কর্মী ও স্বচ্ছতাকর্মীরা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সংক্রামিত রোগীদের সেবা করার মাধ্যমে অসাধারণ দায়িত্ববোধ প্রদর্শন করেছেন। তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে, এই যোদ্ধারা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, মারণ ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট মৃত্যু-ভীতিকে উপেক্ষা করে সামনের সারিতে থেকে ২৪ ঘণ্টা লড়াই করছেন। দেশের সাধারণ নাগরিক এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুকেও একত্রিত হয়ে বিপন্ন মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কোনো প্রচেষ্টা বাকি রাখছেন না। এই দুঃসময়েও কেউ কেউ মানুষের বিপন্নতাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা করছে কিন্তু সেসব ছাপিয়ে যে ছবিটি উঠে এসেছে তা হলো— সরকার, প্রশাসন ও সমাজের মধ্যে সংবেদনশীলতা, সহযোগিতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ছবি। মহিলারাও স্বেচ্ছায় অতিমারী মোকাবিলার এই কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছেন। মহামারীর কারণে জীবিকা হারিয়ে যারা দুর্ভাগ্য ও ক্ষুধার মুখোমুখি হয়েছিলেন বা এই কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন তারাও পরিস্থিতির বাস্তবতা স্বীকার করে ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, বহু মানুষ যারা নিজেদের সমস্যা উপেক্ষা করে অন্যকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাদের কথা আমরা জানতে পারছি, অনুভব করছি। বিভিন্ন রাজ্যে থাকা পরিযায়ীদের তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, পথে খাবারের ব্যবস্থা করা, বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, অসুস্থ বা অভাবী মানুষদের দোরগোড়ায় খাবার ও ওষুধ সরবরাহ করা, এ জাতীয় গুরুতর প্রয়োজন মেটাতে সম্মিলিতভাবে সমগ্র সমাজ উদ্যোগ নিয়েছিল। এরকম একটা পর্বত প্রমাণ সমস্যার সমাধান করতে প্রয়োজনীয় নতুন ধরনের পরিষেবা দিয়ে আমাদের সমাজ ঐক্য ও সংবেদনশীলতার অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত আমাদের আবহমানকালের স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের অবদান— এই সময়কালে আর একবার প্রমাণিত হয়েছে।

সামাজিক ঐক্য, বিপন্ন সময়ে সহানুভূতি এবং সহযোগিতার আবহ— ইত্যাদি যেসব বিষয়কে সামাজিক সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যা আমাদের শতাব্দী প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিফলন— এই সময়কালে আমরা সেসব অভিজ্ঞতার সামনে হয়েছিলাম। অনেকে মনে করেন স্বাধীনতার পর এই প্রথম ধৈর্য, সমষ্টি ও আত্মবিশ্বাসের এ ধরনের অভিজ্ঞতা হলো। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে যারা পরিচিত যারা অপরিচিত, যারা জীবিত আছেন কিংবা যারা সেবার জন্য জীবন দিয়েছেন, চিকিৎসক, পৌরসভার কর্মী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবায় যারা যুক্ত আছেন তাদের সকলের অবদান স্বীকার করি এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তারা সকলেই প্রশংসনীয়। আর যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরও আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

বর্তমানের প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা উদ্যোগ প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় চালু করা, প্রয়োজনে শিক্ষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, শিক্ষার্থীদের তাদের স্কুল এবং কলেজে পাঠানো, প্রয়োজনে তাদের ফিজের ব্যবস্থা করে দেওয়া— সামাজিক পুনর্নির্মাণের জন্য এই কাজগুলি জরুরি। এমন অনেক স্কুল যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই। যে সমস্ত অভিভাবকরা তাদের চাকরি হারিয়েছেন বা যাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে তারা তাদের সন্তানের ফিজ দিতে পারছেন না। শিক্ষকদের বেতন এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, স্কুল খোলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা— সহায়তা দিতে হবে। একস্থান ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য অনেকেই কাজ হারিয়েছেন। কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে তারা অন্যান্য অচেনা ক্ষেত্রে কাজ খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে কাজ পেতে গেলে পূর্ব প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কাজ হারানো মানুষদের সামনে আজ এগুলো বড়ো সমস্যা। আবার পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেলে আসা কাজ সম্পন্ন করার জন্য বদলি শ্রমিক খুঁজে পাওয়াও একটি সমস্যা হয়ে উঠেছে। সুতরাং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং অদক্ষদের প্রশিক্ষণ প্রদান

অপরিহার্য। যে ক্ষেত্রে পরিবারগুলি এইরকম প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে, সেসব পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাপ বাড়ছে। অপরাধ, হতাশা এবং আত্মহত্যার মতো নেতিবাচক মনোভাব রোধ করার জন্য এই মুহূর্তে পরামর্শ এবং সহায়তা পরিষেবাদির বিস্তার প্রয়োজন।

মার্চ মাস থেকেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এই কঠিন পরিস্থিতিতে যেখানেই ফাঁক-ফোঁকর আছে প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করছেন। উপরে বর্ণিত নতুন সেবা উদ্যোগগুলিতে তারা আন্তরিকভাবে অবদান রাখছেন। আমি আশাবাদী যে সমাজের অন্যান্য সদস্যরাও নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাটি আরও বিশদভাবে বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় অবদান রাখবেন।

এই ভাইরাস সম্পর্কে এখনো আমাদের বিশ্বে কোনো সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে ওঠেনি। এটি একটি সংক্রমণযোগ্য জীবাণু যা দ্রুত বিস্তার লাভ করে, কিন্তু এর মারণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম— এটুকুই আমরা জানতে পেরেছি। সুতরাং দীর্ঘসময় এই রোগজীবাণু থেকে নিজেকে রক্ষা করা অপরিহার্য। একই সঙ্গে এর ফলে উদ্ভূত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ যা আমাদের সমাজের সদস্যদের প্রভাবিত করছে সেগুলির প্রতিকার সন্ধানের প্রক্রিয়াটিও দীর্ঘমেয়াদী হবে। যদিও আমাদের অবশ্যই ভয়কে জয় করতে হবে তবে সেই সঙ্গে আমাদের সতর্কতা ও কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে। সামাজিক জীবন স্বাভাবিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং অন্যকেও তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

এই অতিমারীটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় আমাদের সমাজের আরও অনেকগুলি বিষয় উঠে এসেছে। সারা বিশ্বজুড়ে সেসব বিষয় নিয়ে নিবিড় ভাবনা চিন্তার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'নিউ-নর্মাল' বা 'নতুন-স্বাভাবিক' কথাটি প্রায়ই কথোপকথনে উঠে আসছে। করোনা অতিমারীটি মানব জীবনকে যেন সম্পূর্ণ স্থবির করে তুলেছে। মানুষ অভ্যাসবশত এমন অনেক কাজ যা আগে রোজ করতো সেসব বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের এইসব কাজগুলোর মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যেসব অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আমরা অতি প্রয়োজনীয় হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছিলাম সেগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। আর যেগুলো আমাদের জীবনে আবহমানকাল ধরে আছে, সেগুলো সত্যিই অপরিহার্য সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়নি। কিছু কাজকর্ম খানিকটা কম হচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়নি।

লকডাউনের এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় বায়ুর গুণগতমানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। নদী, ঝরনা, পুকুরের মতো জলাশয়গুলি পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং পরিষ্কার জলের স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। পাখির শ্রুতিমধুর কলতান আবার মানুষের স্মৃতিকে আলোড়িত করেছে। আশেপাশের পার্কগুলিতে বা শহরের ফাঁকা জায়গায় তাদের ডাক শোনা যাচ্ছে। আরও সম্পদশালী হওয়ার তাড়না এবং সব কিছু বেশি পরিমাণে পাবার আগ্রাসী মনোভাব আমাদের জীবনের প্রাথমিক কিছু ক্রিয়াকলাপ ও অনুভব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল; সেগুলো আজ প্রয়োজনের সময় আমাদের কাছে আবার ফিরে এসেছে এবং জীবনের অর্থ ও আনন্দ নতুন করে বুঝতে শেখাচ্ছে। আমরা কিছু সদ্‌গুণের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। করোনা অতিমারীটি আমাদের মানবতার অস্থায়ী ও স্থায়ী এবং চিরন্তন ও আপাত— এই বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য করতে শিখিয়েছে। চিরন্তন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষ আবার ভাবতে শুরু করেছে এবং দেশ-কাল অনুসারে ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন কীভাবে করা যায় সেসব নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। মানুষ আবারও পারিবারিক ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং প্রকৃতির সঙ্গে সুসঙ্গত সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে।

এই অনুধাবনগুলি কেবলমাত্র অতিমারীর প্রকোপের তাৎক্ষণিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, নাকি মানুষ সত্যিই অন্য অবস্থানে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে— তার উত্তর সময় দেবে। তবে, একটি বিষয় পরিষ্কার যে এই বিপর্যয় সেই চুম্বকের ভূমিকা পালন করেছে যা সমস্ত মানবচেতনাকে জীবনের প্রাণবন্ত মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সাম্প্রতিককাল অবধি বাজারের শক্তির ভিত্তিতে বিশ্বকে এক করার দর্শন মানবিকতার ওপরে প্রাধান্য পেত কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই সর্বশেষ ঘটনা বিশ্বমননে এক নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে তা হলো— প্রতিটি দেশের নিজস্ব ও অনন্য শক্তি এবং সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে জীবন রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অনুশীলন সম্ভব। 'স্বদেশী' দর্শন আবার আলোচ্য সূচিতে গুরুত্ব পাচ্ছে। বর্তমান ভারতীয় প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব নতুন শব্দবন্ধ পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা এবং সেই পথগুলি পুনর্নির্মাণের সময় এসেছে যা আমাদের সময়-পরীক্ষিত মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের দিকে নিয়ে যায়। এই অতিমারীর প্রকোপ সৃষ্টিতে চীনের ভূমিকা বিতর্কিত হতে পারে তবে তাদের আর্থিক-সামরিক শক্তির অপব্যবহার করে ভারত সীমান্তে সন্ত্রাস চালিয়ে এবং আমাদের অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ করার অপচেষ্টা সারা বিশ্ব জেনে ফেলেছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী, সরকার ও জনগণ এই হামলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে দৃঢ়তা, আত্মসম্মান ও সাহসিকতার প্রকাশ ঘটে তা চীনকে হতবাক করে দিয়েছে। আরও এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, সচেতনতা এবং দৃঢ় মনোভাব বজায় রাখতে হবে। অতীতেও বিশ্ব বারবার চীনের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছে। অর্থনীতিগতভাবে ও কৌশলগতভাবে চীনকে ছাপিয়ে যাওয়া, আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও উন্নত করা— এই সমস্ত উপায়ে চীনের এই দানবীয় আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছেন তাতে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল ও মায়ানমারের মতো প্রতিবেশী দেশ যাদের সঙ্গে আমাদের

সুসম্পর্ক আছে তাদের প্রকৃতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভাবগত অনেক মিল আমাদের সঙ্গে আছে। এই দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ভিন্ন মতামত, বিতর্কিত ইস্যু এবং পুরনো অভিযোগগুলির কারণে যে প্রতিবন্ধকতা আসবে আমাদের সেগুলো খুব শীঘ্রই নিষ্পত্তি করা উচিত। আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। এটাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাদের উদারতাকে দুর্বলতা ভেবে আসুরিক শক্তি দ্বারা আমাদের বিভক্ত করা বা দুর্বল করার কোনো প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। আমাদের বেপরোয়া শত্রুদের এখন এটা জানা উচিত। ভারতমাতার দেশপ্রেমিক সন্তান এবং তাদের বীরত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, শৌর্য এবং নাগরিকদের অদম্য নৈতিকতা ও ধৈর্য চীনকে একটি দৃঢ় ও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে— এটা প্রয়োজন ছিল। এটি অবশ্যই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে। তবে যদি তারা উলটে চাপ বাড়াতে থাকে তবে আমাদের সতর্কতা, দৃঢ়তা ও তৎপরতার অভাব হবে না— এটা এখন আমাদের দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য শুধুমাত্র বাহ্যিক হুমকি ও বিপদ সম্পর্কেই আমাদের সচেতন থাকলে হবে না। গত বছরের বেশ কিছু ঘটনা সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমাজের মানুষের আরও সতর্কতা, বোঝাপোড়া, সংহতি এবং সরকারি সংস্থা ও জাতীয় নেতৃত্বের আরও প্রস্তুতি প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে যারা যেখানে আছে তারা সেখানে ক্ষমতা দখলের জন্য চেষ্টা করবে— এটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ বিষয়, তবে, শত্রুদের মধ্যে যেমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এক্ষেত্রে তা হওয়া কাম্য নয়। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা অনুশীলন করা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সর্বদা স্বাগত, তবে যে প্রতিযোগিতা ঘৃণা, তিক্ততা এবং শত্রুতাকে উস্কে দেয় যা সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয় তা কাম্য নয়। প্রতিপক্ষের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সুযোগ দেখতে পাওয়া শক্তিগুলি, যারা ভারতকে দুর্বল ও খণ্ডিত করার ইচ্ছা পোষণ করে, যারা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের বৈচিত্র্যকে পার্থক্য হিসাবে দেখে আসছে তারা এই বিশ্বে এবং ভারতে যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। তাদের সেই সুযোগ আমাদের দেওয়া উচিত নয়। সরকারি সংস্থাগুলির উচিত অপরাধ ও সহিংস প্রবণতাগুলিতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি এধরনের ঘটনা চলতেই থাকে, তবে দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য সাধারণ মানুষের সাহায্য নেওয়া। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে আমাদের কাজ যেন দেশবিরোধী শক্তির জন্য কোনো সুযোগ তৈরি না করে। এটি নিশ্চিত করার জন্য, সরকারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টির প্রকাশ বা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই জাতীয় অখণ্ডতার কথা মাথায় রেখে করা উচিত। আমাদের সকল ধর্ম, অঞ্চল, বর্ণ এবং ভাষাগত পটভূমির লোকদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিত এবং সাংবিধানিক সীমার মধ্যে থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে, যারা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছে বা এর বিরোধিতা করেছে, তারা নিজেদের গণতন্ত্র, সংবিধান এবং ধর্মনিরপেক্ষতার চ্যাম্পিয়ন বলে দাবি করে আমাদের দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। ১৯৪৯ সালের ২৯ আগস্ট গণপরিষদে তাঁর ভাষণে শ্রদ্ধেয় ড. ভীমরাও আম্বেদকর এই দুষ্কৃতীদের অপকর্ম বর্ণনা করতে 'নৈরাজ্যের ব্যাকরণ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ছদ্মবেশে থাকা দুষ্কৃতীদের আমাদের সনাক্ত করতে হবে এবং আমাদের ভাই-বোনদের সতর্ক করতে হবে যাতে তারা যেন এই ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়ে পড়ে।

সঙ্ঘ সম্পর্কে এই ধরনের বিভ্রান্তি এড়াতে নির্দিষ্ট শব্দবন্ধের প্রতি সঙ্ঘের আগ্রহ এবং কীভাবে এই শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা হয় তা অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুত্ব এমন একটি শব্দ। এটির সঙ্গে রীতি ও পূজা পদ্ধতিকে যুক্ত করে এর অর্থ বিকৃত করা হয়েছে। সঙ্ঘ এই সংজ্ঞা বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করে না। আমাদের কাছে এটি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এবং ভারতবর্ষের মূল্যবোধ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সম্পদ যে শব্দ আমাদের পরিচয় প্রকাশ করে। সুতরাং সঙ্ঘ বিশ্বাস করে যে এই শব্দটি দেশের ১৩০ কোটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নিজেকে ভারতবর্ষের পুত্র এবং কন্যা বলে মনে করেন, যারা দৈনন্দিন জীবনে একটি নৈতিকতা অর্জনের জন্য প্রয়াস করেন এবং যারা তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা আমাদের দেশকে যে ঐক্যসূত্র বেঁধে রেখেছে তাকে দুর্বল করে। এই কারণেই এই শব্দটি ছদ্মবেশীদের প্রথম লক্ষ্য যারা অভ্যন্তরীণ বিবিধতাধকে উস্কে দিয়ে আমাদের দেশ ও সমাজকে বিভক্ত করার চক্রান্ত করছে। তারা আমাদের আবহমানকালের বিভিন্নতা যা ঐতিহ্যগতভাবে গৃহীত, সম্মানিত এবং বাস্তবে হিন্দু দর্শনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের একটি অংশকে বিভেদের মাপকাঠি হিসাবে দেখিয়ে, বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতার উপাদান হিসাবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে। 'হিন্দু' কোনও সম্প্রদায়ের নাম নয়, এটি কোনও প্রাদেশিক ধারণা নয়, এটি কোনও একক বর্ণ বা বংশ নয় বা নির্দিষ্ট ভাষাভাষী মানুষের পরিচয় বা বিশেষণ নয়। এটি সেই শব্দ যা অগণিত স্বতন্ত্র পরিচয়কে সম্মান দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করে। এই শব্দটি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কারও কারও আপত্তি থাকতে পারে। যদি তাদের ভাবনা চিন্তা একই হয় তবে আমরা তাদের অন্য শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করি না। যাইহোক, দেশটির অখণ্ডতা এবং সুরক্ষার স্বার্থে সঙ্ঘ কয়েক বছর ধরে বিনম্রতার সঙ্গে হিন্দু শব্দের উচ্চারণ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাখ্যাগুলিকে একীভূত করেছে। সঙ্ঘ যখন বলে যে হিন্দুস্থান হিন্দুরাষ্ট্র, তখন এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বা শক্তিকেন্দ্রিক ধারণা থাকে না। হিন্দুত্ব এই রাষ্ট্রের 'স্ব' এর নির্যাস। আমরা স্পষ্টভাবে দেশটির স্বকীয়তাকে হিন্দুত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছি কারণ আমাদের সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কর্ম, আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত এবং সামাজিক জীবন এই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবনদর্শনের এই পরিধির মধ্যে আসার জন্য বা থাকার জন্য

কাউকে তার বিশ্বাস, ভাষা, বাসস্থানগত বা অন্য কোনও পরিচয় ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। তবে শুধু আধিপত্যের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে হবে। প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে এবং স্বার্থপর ও ঘৃণ্য শক্তির হাত থেকে দূরে থাকতে হবে যারা আধিপত্যবাদের ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ও উস্কে দিয়ে উগ্রবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহিত করে। আমাদের দেশের তফশিলি-বর্ণ, তফশিলি-উপজাতি এবং তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ঘৃণা তৈরি করে যে অনাদি ঐক্য ভারতবৈচিত্র্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে বিভক্ত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চলছে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' (ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে)-এর মতো স্লোগান প্রচারও করে। রাজনৈতিক স্বার্থ, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং মৌলবাদী শক্তিগুলির একটি অদ্ভুত জোট, ভারতবর্ষে বিদ্বেষ ছড়ানোর এবং বৈশ্বিক আধিপত্য বিস্তারের ষড়যন্ত্র করছে। আমাদের ধৈর্য সহকারে বিষয়টি গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে। এই শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে আমাদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজকে সংহত করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আমরা যদি আত্ম নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করি, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখি এবং একে অপরের স্বার্থকে মাথায় রাখি তাহলে পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ বিরাজ করতে পারে যা পুরানো দ্বন্দ্বের সমাধানে সহায়তা করবে, অবিশ্বাস যা পরস্পরবিরোধী আচরণ থেকে উদ্ভূত তা এই সব সমস্যার সমাধানগুলিকে জটিল ও অসম্ভব করে তুলতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভীতিজনক অবস্থান এবং অযৌক্তিক বিরোধিতা অনিয়ন্ত্রিত সহিংসতার দিকে আমাদের চালিত করে এবং দেশের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার পথকে প্রশস্ত করে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের, বন্ধুত্বের, ধৈর্যের এবং সংযমের বাতাবরণ নির্মাণ করতে হলে আমাদের সকলকে একটি বৃহত্তর পরিচয় ও সত্যকে স্বীকার করতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভক্ষতির নিরিখে আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলি সময়ের সঙ্গে গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যেতে পারে না। ভারত থেকে ভারতীয়ত্বকে বাদ দেওয়া যায় না। এটি করার অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এটি প্রমাণ করার জন্য আমাদের সামনে অনেক উদাহরণ রয়েছে। এখন উপলব্ধি করার সময় যে আমাদের শুভবুদ্ধি আমাদের সকলকে একক অনুভূতির সঙ্গে সংহত হয়ে চলার জন্য প্রাণিত করছে। শুধু সহিষ্ণুতা নয় সকলকে গ্রহণ করা— ভারতবর্ষের মানবিক একতা বা চেতনা, নানাবিধ বিশ্বাসের গ্রহণযোগ্যতা এবং সমর্থন— এটি হিন্দু সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং হিন্দু সমাজের সহনশীলতার ফল এবং স্বীকৃত সত্য। এটাই এই সময়ে প্রয়োজন। সঙ্ঘের প্রায় প্রতিটি বিবৃতিতে 'হিন্দু' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, তবুও এটি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে কারণ সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি সমমনস্ক শব্দ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'স্বদেশী' এমনই একটি শব্দ যা আজকাল বহু আলোচিত। এখানে 'স্ব' বলতে একই হিন্দুত্বকে বোঝায়। আমাদের অত্যন্ত সহনশীল ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই চিরন্তন দর্শনটি আমেরিকার ভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সকলকেই ভাই এবং বোন হিসাবে সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে, যার অর্থ আমরা সবাই একটি পরিবারের অংশ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজে' এই একই ধারণার উপর ভিত্তি করে ভারতীয় পুনর্জাগরণের জন্য একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্পষ্টভাবে জোর দিয়েছিলেন। শ্রী অরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়ার ভাষণে এটি ঘোষণা করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের পরে আমাদের আত্মানুশীলন এবং চিন্তাভাবনা এবং বেশ কয়েকটি জাতীয় সংস্থার দ্বারা পরিচালিত অনুশীলনের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে ভারতবর্ষের সেই একই চেতনার প্রতিচ্ছবি রয়েছে। সেই স্পিরিট বা 'স্ব' যেন আমাদের বৌদ্ধিক ভাবনা ও কর্ম পরিকল্পনাকে কম্পাসের মতো দিক নির্দেশ করে। এটি এমন আলো হওয়া উচিত যা আমাদের দেশের সম্মিলিত চেতনার দিকনির্দেশ, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যাশাকে আলোকিত করে। বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টার ফলাফল এবং তাদের পরিণতি এই নীতি অনুসারে হওয়া উচিত। তারপরে এবং তারপরেই ভারত স্বাবলম্বী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করবে। উৎপাদনের স্থান এবং প্রক্রিয়াতে জড়িত কর্মশক্তি, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় থেকে উদ্ভূত আর্থিক লাভ এবং উৎপাদনের অধিকার অবশ্যই আমাদের জাতীয় নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। তবে শুধু এগুলোই কোনো পদ্ধতিকে স্বদেশী আখ্যা দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বিনোবা ভাবেজী স্বাবলম্বন এবং অহিংসার সংমিশ্রণকে স্বদেশী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। দত্তোপন্ত ঠেংড়িজী শুধুমাত্র স্বদেশী পণ্য ও পরিষেবার মধ্যে এই ভাবনাকে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় স্বনির্ভরতা, সার্বভৌমত্ব এবং সাম্য অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অবস্থান অর্জনের পক্ষে বলেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি অবস্থান অর্জনের জন্য তখনই আমরা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্র এবং নতুন প্রযুক্তি সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে সুবিধা প্রদান করবো যখন তারা আমাদের শর্তাদি এবং পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী চলবে। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতেই হতে হবে।

স্বনির্ভরতা মানে নিজের উপর নির্ভরতা থাকতেই হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গন্তব্য এবং আমাদের পথ স্থির করে। এমনকী বাকি বিশ্ব যে পথে হাঁটছে সে পথে হেঁটে আমরা হয়তো একটি প্রধান অবস্থান অর্জন করতে পারি বা এটিও অবশ্যই একটি সাহসী বিজয় হবে কিন্তু এর মধ্যে 'স্ব' এর চেতনা এবং অংশগ্রহণের অভাব থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের কৃষিক্ষেত্র নীতি নির্ধারণের সময় আমাদের কৃষককে তার বীজব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ, সার ও কীটনাশক তৈরি করতে বা তার গ্রামের পাশের অঞ্চলগুলি থেকে সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তাঁকে পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্প সম্পর্কে শিক্ষিত করতে হবে। এ জাতীয় সুবিদাগুলিতে তার অধিকার থাকা উচিত। আমাদের কৃষির গভীর, বিস্তৃত এবং প্রাচীন

ইতিহাস রয়েছে। সুতরাং নতুন নীতিগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের কৃষককে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন করা এবং সময়ের সঙ্গে পরীক্ষিত, প্রাসঙ্গিক ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে মিশ্রিত করার ক্ষমতা প্রদান করা। নীতিগুলি এমন হওয়া উচিত যে একজন কৃষক এই গবেষণাগুলির সুফল লাভ করতে পারে এবং তার উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে লাভের লক্ষ্য হিসাবে কর্পোরেট সেক্টর দ্বারা স্পনসর হওয়া গবেষণা বা বাজার শক্তি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের তৈরি কোনো ফাঁদে না পড়ে, তবেই এই জাতীয় নীতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সত্যিকারের স্বদেশী কৃষি নীতি হতে পারে। বর্তমান কৃষি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই পরিবর্তনগুলি সংযুক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে নীতিগুলির প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলিকে বাস্তবে রূপান্তর করতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আমাদের অর্থনৈতিক, কৃষি, শ্রম, উৎপাদন ও শিক্ষানীতিতে এই 'স্ব'-কে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিস্তৃত আলোচনা ও সংলাপের ভিত্তিতে গঠিত একটি নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা ও চালু করা হয়েছে। পুরো শিক্ষামূলক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সঙ্ঘও একে স্বাগত জানিয়েছে। স্বদেশীর সম্ভাবনা অনুসন্ধানে 'স্থানীয়দের পাশে দাঁড়ান'— 'ভোকাল ফর লোকাল'— একটি দুর্দান্ত শুরু। তবে, এই উদ্যোগগুলি সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণের জন্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতএব এই বিস্তৃত দৃষ্টিকোণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে 'স্ব' বা আত্ম— এই মনোভাবটি আত্মস্থ করতে হবে, তবেই আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারি।

আমাদের ভারতীয় চিন্তাভাবনা অগ্রগতির একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে সংঘাতকে সমর্থন করে না। অবিচার নির্মূল করার সর্বশেষ উপায় হিসাবে সংঘাত বা সংগ্রাম বিবেচিত হয়। এখানে অগ্রগতির ধারণাটি সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে। সুতরাং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধতার চেতনা গুরুত্বপূর্ণ। স্বনির্ভরতা তখন মূলত একে অপরের সঙ্গে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র জাতির সামগ্রিক সুস্থতা ও উন্নতি বোঝায় যা একটি দেহের পরস্পর নির্ভরশীল অঙ্গগুলির মতো। একটি নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া যেখানে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তি এবং দলগুলি ব্যাপকভাবে আলোচনা করে এবং মুক্ত আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেখানে সকলের মধ্যে ঐক্য ও বিশ্বাসের মনোভাব গড়ে ওঠে। সবার সঙ্গে মুক্ত সংলাপ, আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমত্য স্থাপন, সহযোগিতা ও বিশ্বাস নিশ্চিত করা— এটি একটি পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।

(আমাদের কথা এক হউক, আমাদের কণ্ঠ ঐক্যবদ্ধ করুন। আমাদের মন বুদ্ধি চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হোক। একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে আমরা অংশগ্রহণকারী, আমরা এক হিসাবে উপাসনা করি)

সৌভাগ্যক্রমে, আমরা বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর নির্ভর করতে পারি এবং আশা করতে পারি যে সমস্ত মানুষের মধ্যে ছোটো এবং বড়ো বিষয়গুলির সঙ্গে একতা ও বিশ্বাসের অনুভূতি তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন। আরও ভালো উপায়ে এই কাজটি সহজতর করার জন্য সমাজকে সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে এবং একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও সংবেদনশীল এবং স্বচ্ছ হতে হবে। পারস্পরিক সম্মত নীতিগুলির তাৎক্ষণিক প্রয়োগের জন্য ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। কিছু সতর্কতা এবং শেষ বিন্দু অবধি প্রস্তাবিত নীতিমালা বাস্তবায়নের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাৎপর্যপূর্ণ। নীতি-গঠনের তাৎক্ষণিকতা এবং স্বচ্ছতার পাশাপাশি নীতির রূপায়ণের মধ্যেই নীতির সার্থকতা।

করোনার এই বিপন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের উদ্যোগকে সহায়তা করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, স্ব-কর্মসংস্থান- উপযোগী ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বনির্ভর উৎপাদন ইউনিটসমূহকে সহায়তা দিয়ে কৃষিক্ষেত্র ও উৎপাদন খাতের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেশের নীতিনির্ধারকদের পাশাপাশি অনেক বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে স্বল্প-সময়ের এবং স্থায়ী উদ্যোক্তা থেকে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সাফল্যের স্বাদ নিতে আগ্রহী। সরকারকে তাদের অতিরিক্ত সমর্থন দিতে হবে যাতে তারা বিশ্বমান অর্জন করতে পারে যা তাদেরকে বিশ্বের অন্যান্য অর্থনৈতিক শক্তির পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ তৈরি করতে দেয়। তহবিল বরাদ্দের পাশাপাশি তৃণমূল স্তরে এর প্রকৃত বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে যাতে করোনার সংকটের ছয় মাস পরে তারা আবার উদ্যোগ চালু করতে পারে।

একটি অগ্রগতি অনুকূল মানসিকতার সঙ্গে দেশের উন্নয়নের গন্তব্য আমাদের জনগণের সংস্কৃতি এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। সকল মতামত থেকে ইতিবাচক অবদানের সঙ্গে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার পরে আমাদের অবশ্যই সম্পাদন পরিকল্পনাটি স্থির করতে হবে। যদি এটি নিশ্চিত করা হয় যে উন্নয়নমূলক সাফল্যের পুরস্কারগুলি সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে পড়েছে, যদি মধ্যস্থতাকারী এবং দালাল দ্বারা শোষণ এবং চাঁদাবাজি দূর হয়, নির্মাতারা ও উৎপাদনকারীদের বাজার এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সঙ্গে সরাসরি আদান প্রদান ঘটে, কেবলমাত্র তখনই আমাদের স্বপ্নগুলি সত্য হতে পারে, অন্যথায় লুকিয়ে থাকা ব্যর্থতার কারণগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে। যদিও উপরে বর্ণিত সমস্ত প্রস্তাবনাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যযুক্ত তবু একটি সমাজের সম্মিলিত সংকল্পই হলো দেশটির উন্নয়নের ভিত্তি। করোনার পরে যে চেতনা বিরাজ করছে, যেমন 'স্ব'-এর সত্যিকার অর্থ উপলব্ধি করা,

সমস্ত মানুষের সঙ্গে একাত্মতার ভাব, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ , পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব এবং এর ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত তা আমাদের সমাজ দ্বারা উপেক্ষা করা হবে না। আমাদের অবশ্যই এই মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি হারাবো না এবং অসংবেদনশীল আচরণের জগতে ফিরে যাব না। পুরো সমাজের সঠিক আচরণ এবং দায়িত্বশীল আচরণের সমন্বয় এবং ধারাবাহিক অনুশীলন সাফল্য আনতে পারে। ছোটো পরিবর্তনগুলি দিয়ে শুরু করা, নিয়মিত সচেতনতামূলক উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে এই আচরণগত পরিবর্তন হতে পারে। প্রতিটি পরিবারই এই আন্দোলনের একটি অংশ হতে পারে। সপ্তাহে একবার পরিবারের সমস্ত সদস্য একসঙ্গে কিছু প্রার্থনা করতে এবং বাড়িতে তৈরি খাবারের পরে দুই থেকে তিন ঘণ্টা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করতে পারেন। উপরিউক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ছোটো পরিবার স্তরে প্রস্তাব নেওয়া যেতে পারে, সেই আলোচনায় উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে, যা পরবর্তী সপ্তাহের আলোচনায় আরও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পরিবারে আলোচনার কাজটি মূল বিষয়/বিষয়টির নবীন বা পুরনো হওয়া কোনো ব্যাপার নয়— বিশ্লেষণের ফলাফলগুলিই কেবলমাত্র বিষয়টির কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করে। আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি এই পদ্ধতিটি বর্ণনা করে—

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজান্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়েন বুদ্ধিঃ।

আমরা যদি বিষয়টিকে সমাগ্রিকভাবে ঘরোয়া পারিবারিক প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করি, বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে বিবেচনা করে এবং পছন্দমতো কোনও মতামত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করি, তবে ফলস্বরূপ আচরণগত পরিবর্তনগুলি সম্ভবত স্থায়ী হতে পারে।

শুরুতে, পারিবারিক ব্যবস্থা, বাড়ির গঠন, আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতি, দীর্ঘকালীন রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের মতো সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সকলের পরিবেশগত ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কারণে, আমাদের উঠোন ও ছাদে ফুলের গাছ, ফলের গাছ ও শাকসবজির চারা রোপণের মাধ্যমে সবুজ বৃদ্ধি, প্লাস্টিকের প্যাকেট বয়কট করার উপায়, জল সংরক্ষণের উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে এবং যৌথভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সময় ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করি। আমরা আমাদের সমাজের জন্য প্রতিদিন কী পরিমাণ অর্থ ও সময় ব্যয় করতে পারি এবং কীভাবে এটি করা যায়? বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলভুক্ত এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ ও পরিবারের সঙ্গে আমাদের কী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে? আমরা কী গভীরভাবে মিশেছি— খাবার ভাগ করে নিয়েছি এবং সেই পরিচিতদের বাড়িতে গিয়েছি? সামাজিক সম্প্রীতির প্রচারের জন্য এগুলি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও উদ্যোগগুলিতে আমাদের পরিবারের অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া যেতে পারে। যেমন--- আমাদের পরিবার রক্ত দান, মরণোত্তর চক্ষু দান ইত্যাদি কাজে অবদান রাখতে পারে বা এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে। এ ধরনের ছোটোখাটো উদ্যোগগুলির মাধ্যমে, সম্প্রীতি, ধৈর্য, শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যক্তিগত আচরণের অনুশীলন করা যায়। ফলস্বরূপ, নাগরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের সম্মিলিত আচরণ এমন হয়ে ওঠে যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে।

আমরা যদি একজন সাধারণ মানুষের সচেতনতার সাধারণ স্তর বাড়াতে এবং তার একাত্মতার চেতনাটিকে হিন্দুত্বের সঙ্গে চালিকা শক্তি হিসাবে লালন করার জন্য কাজ করি, যদি আমরা আমাদের দেশের কাঠামোর গভীরতা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নমূলক অগ্রগতির জন্য স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা করি এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের আন্তঃনির্ভরতা স্বীকার করি, যদি আমাদের কোনও স্বপ্ন অর্জনের জন্য আমাদের সম্মিলিত শক্তির উপর আস্থা থাকে এবং আমাদের মূল্যবোধের মূল ভিত্তি নির্ধারণ করে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে আবির্ভূত হবে এবং সেই ভারতবর্ষ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠবে যা সমগ্র মানবজাতিকে শান্তি ও অগ্রগতির পথ দেখিয়েছিল।

এই জাতীয় এক-একটি পরিবারের আচরণ পুরো দেশে ভ্রাতৃত্ববোধ, অর্থবহ পদক্ষেপ এবং আইনি শৃঙ্খলার সামগ্রিক পরিবেশ তৈরি করবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ১৯২৫ সাল থেকে সরাসরি সমাজে এই পরিবর্তনগুলি কার্যকর করার কাজ করে যাচ্ছে। এ জাতীয় সংগঠিত রাষ্ট্র একটি সুস্থ সমাজের প্রাকৃতিক রাষ্ট্র। এ জাতীয় সংগঠিত সমাজ হলো বহু শতাব্দী ধরে আক্রমণের অন্ধকারের পরে স্বাধীন হওয়া এই দেশের পুনরুত্থানের পূর্বশর্ত।

আমাদের মহান পূর্বপুরুষরা এ জাতীয় সমাজ গঠনে কাজ করেছেন। স্বাধীনতার পরে এই লক্ষ্যটিকেই মাথায় রেখে, আমাদের সংবিধানে সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নিয়মকানুন তৈরি হয়েছিল এবং আমাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছিল। সঙ্ঘের কাজ কেবল আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে, পারস্পরিক সম্প্রীতির আচরণ, ঐক্যের চেতনা এবং জাতীয় স্বার্থের অনুভূতি সব কিছুর ওপরে।

স্বয়ংসেবকরা অন্তরিকভাবে, নিঃস্বার্থভাবে এবং নিবেদিত প্রাণ হয়ে এই লক্ষ্য উপলব্ধি করার কাজ করে চলেছে। পুনর্গঠনের এই অভিযানে আপনারা সবাই তাদের সঙ্গে হাত লাগান— এই আমার আন্তরিক আহ্বান।

।। ভারতমাতা কী জয় ।।

*(নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিদয়াদশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ)*

# চীনের দালাল পাকিস্তানের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গিলগিট বালটিস্তান

শিশির গুপ্ত

**কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপে চীন তার কুমতলব ও লগ্নি মার খেতে পারে এমন আন্দাজ করেছিল। তারা ইমরানকে এই নিয়ে অশান্তি তৈরি করায় মদত দিচ্ছিল। ওদিকে লোক দেখানো ভাবে ইমরান গিলগিটে গিয়ে লোকেদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় কসুর করেনি। গিলগিট বালটিস্তানের অসহায় অবস্থা পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সাধনে সুবিধে করে দিচ্ছে।**

গত বছর আগস্ট মাসে জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর চীনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। পাকিস্তান বরাবরই চীনকে প্রলুব্ধ করে এসেছে এই বলে যে জম্মু-কাশ্মীর তাদেরই অধিকৃত রাজ্য। এই সূত্রে বিদেশ সচিব হর্ষ শ্রিংলা জর্মানিতে বলেছেন পৃথিবীতে আজকাল দেনার দায়ে জড়িয়ে দেওয়ার এক ধরনের কূটনীতি চালু হয়েছে। অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার আগে একটি সার্বভৌম দেশকে ঋণের শর্তের তাৎপর্য সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

পাকিস্তানের কিন্তু চীনের সঙ্গে সরাসরি কোনো সীমান্ত নেই। কেবলমাত্র অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তর দিকে গিলগিট বালটিস্তানের মাধ্যমেই তাকে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। আগে এ অঞ্চলে চীনের কেবল মাত্র 'শাক্সগাম উপত্যকার' ওপরই নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন ছিল এখান দিয়ে তারা সিনজিয়াং প্রদেশে শর্টকাটে চলে যেতে পারত। চীনকে খুশি করতে ১৯৬৩ সালে ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল পাকিস্তান তাদের উপহার দেয়। এই জমি আদতে অধিকৃত কাশ্মীর থেকে দেওয়া। এর থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের জন্য পাকিস্তানের দরদের ভণ্ডামি পরিষ্কার হয়ে যায়।

শুরু থেকেই পাকিস্তান শিয়াদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করতে ১৯৭৪ সালেই বিভিন্ন আইন পাশ করিয়ে তাদের নানা অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের বসবাসের অঞ্চলকে সুন্নিবহুল অঞ্চলে পরিণত করে। গিলগিট-বালটিস্তানের অধিবাসীদের এখনও ন্যূনতম বুনিয়াদি অধিকার ও সুবিধে দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের দ্বারা অনুমোদন না পেলে তারা তাদের কোনো পছন্দের মানুষকে নির্বাচিত করতেও পারে না। পাকিস্তান চীনকে কারাকোরাম পর্বতমালা অঞ্চলে হাইওয়ে তৈরি করার অধিকার দেয় ওই অঞ্চলের ভঙ্গুর ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। ২০১০ সালে এই ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করায় ধ্বস নেমে স্থানীয় হুনজা নদীর গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। ২০ জন মারা যান ৬ হাজার লোক গৃহহীন হয়। কারাকোরাম হাইওয়ের ২০ কিলোমিটার জলে ডুবে যায়। এতে পাকিস্তানের কোনো শিক্ষা হয়নি। তারা আবার চীনের দ্বারস্থ। চীনের টাকার শেষ নেই। ওই দেনার কূটনীতি প্রয়োগ করে সরাসরি 'আরব সাগরে' পৌঁছনোর পথ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পায়। এই পথে ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছনোও তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে।

একই সঙ্গে চীন পাকিস্তানকে পুরোপুরি কবজা করে ফেলতে পারবে, ভবিষ্যতে তাদের কোনো কাজের বিরোধিতা পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব হবে না— এই সুযোগ তাদের প্রলোভিত করে। এবার চীন কায়দা করে পাকিস্তানকে চীন-পাকিস্তানের ইসলামিক করিডরের টোপ দেয়। পাকিস্তান প্রশাসনিক দিক থেকে আজন্ম একটি এলোমেলো দেশ। এই চাল বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া মানুষকে দেখাবার মতো কোনো উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করার কোনো সঙ্গতিও তাদের নেই। ফলে এই চক্রে তারা সানন্দে জড়িয়ে পড়ে। চীন সঙ্গে সঙ্গে—যে অঞ্চল দিয়ে রাস্তা যাবে তাই নিয়ে কোনো আইনি বৈধতার প্রশ্ন কখনও তোলা যাবে না, এই অঙ্গীকার করিয়ে নেয়। পাকিস্তানের এই সব অঞ্চল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে এতই বিতর্কিত যে আগে 'খাইবার পাখতুন' ও গিলগিটে ডায়ামার বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে তারা এক পয়সাও দেয়নি। কেননা ভারত সরাসরি এই অঞ্চলের ওপর নিজের অধিকার দাবি করেছিল। ১৯৯৮ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর বহুবার পাকিস্তানের জবরদখল নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধায় প্রকল্প আটকে যায়।

বর্তমানে শি জিনপিং পাকিস্তানকে ও ইমরান সরকারকে বাঁচাতে বিগত মে মাসে (২০২০) নতুন চুক্তি করেছে।

লক্ষণীয়, ২০১৭ সালেই পাকিস্তান কিন্তু এই China Pak Eco Corridor বানানোর ভাবনা পরিত্যাগ করেছিল। তখন পাকিস্তানের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর যে সমস্ত শর্ত চীন আরোপ করেছিল তার মধ্যে একটি এরকম ঃ গোটা রাস্তা ও সংলগ্ন অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে চীনের। চীন বরাবরই অন্য দেশে নির্মাণ কাজে ভয়ঙ্কর উৎসাহী অবশ্যই নিজের শর্তে। তাহলে ২০২০ সালে নতুন করে চূড়ান্তভাবে মরীয়া পাকিস্তানের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য দেশের পক্ষে ডায়ামার বাঁধ গিয়ে কতখানি বিপজ্জনক চুক্তি তারা করেছে?

এই মূল চুক্তির সঙ্গে আনুষঙ্গিক যে সমস্ত চুক্তি রয়েছে তা যে পাকিস্তানের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা আম পাকিস্তানীরা ক্রমশ বুঝতে পারছে। সবটাই চীনের স্বার্থ চরিতার্থ করছে। তারা কোনো উপকার পাচ্ছে না। চীনের ব্যাঙ্ক এই সব প্রকল্পে টাকা জোগাচ্ছে। সেখান থেকেই যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ার এমনকী শ্রমিক পর্যন্ত কাজে যোগ দিচ্ছে। পাকিস্তানের রাওয়াল পিণ্ডি, স্কার্ডু প্রভৃতি জায়গার বাজারগুলি সস্তা চীনে মালে ভরে গেছে। পাকিস্তানে এসে চীনেরা পাকিস্তানি লোককে দরকার পড়লেই কুৎসিত গালিগালাজ করতেও কসুর করছে না। ইসলামিক দেশ পাকিস্তানে 'শুয়োর মাংস হারাম' এটি খাওয়ার জন্য খুনখারাপি অনেক হয়ে গেছে। আজকের পাকিস্তানের মাংসের দোকানগুলি চীনাদের উদর ভর্তি রাখতে দিনরাত এক করে শুয়োরের মাংস বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। কোনো প্রতিবাদের প্রশ্নই ওঠে না। স্থানীয় গিলগিট অঞ্চলের মানুষরা বিভিন্ন আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে কেননা তাদের বহু চাষের জমি কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই চীনকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ডামায়ার বাঁধ তৈরির কাজে স্থানীয় অঞ্চল থেকে কোনো নিয়োগ না হওয়ায় মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি করেছে।

গিলগিট বালটিস্তান আইনসভার সদস্য মির্জা হোসেন জানিয়েছেন ২০১১ সালে কোনো আলোচনা ছাড়াই চীনকে ৩০০ খনি লিজ দেওয়া হয়েছে। সকলেই জানেন পাকিস্তানে সরকার চালায় বকলমে সেনা। চীন সেটা ভালোই জানে তাঁরা সিপিইসি (অর্থনৈতিক করিডরে) কর্তা হিসেবে সেনাধ্যক্ষ সালিম বাজওয়াকে বসাতে পাকিস্তানকে বাধ্য করিয়েছে। প্রায় উপনিবেশ হয়ে যায় আরকি। মজার ব্যাপার তাঁর বিরুদ্ধে অজস্র প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও পাক সরকার কোনো তদন্ত করার হিম্মত দেখায়নি। হায়! এই সিপিইসি-কে National Account ability সংস্থার আওতার বাইরে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাতে চীন ও পাকিস্তানের কতিপয় লোক দেশের সম্পদ লুটে নিতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপে চীন তার কুমতলব ও লগ্নি মার খেতে পারে এমন আন্দাজ করেছিল। তারা ইমরানকে এই নিয়ে অশান্তি তৈরি করায় মদত দিচ্ছিল। ওদিকে লোক দেখানো ভাবে ইমরান গিলগিটে গিয়ে লোকেদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় কসুর করেনি। গিলগিট বালটিস্তানের অসহায় অবস্থা পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সাধনে সুবিধে করে দিচ্ছে।

কোনো সঠিক রাজনৈতিক প্রতিবাদ না থাকায় ও কোনও বিরোধীপক্ষ না থাকায় তারা অঞ্চলটিকে প্রায় জায়গির বানিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে সামগ্রিক সুযোগ নিয়ে চীন পাকিস্তানকে ঋণের জালে বেঁধে ফেলেছে। সেই জন্যে ঋণ কূটনীতি ও ফলশ্রুতিতে চোখ রাঙানি আজ পাকিস্তানকে চীনের একটি নিছক খরিদ্দার বা দালাল দেশে পরিণত করেছে। চীনের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে।

***(লেখক একজন ভারতীয় কূটনীতিবিদ)***

*With Best Compliments From :-*

**Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.**

*Coal Merchants & Commission Agents*

32, Ezra Street, Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

*শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—*

**উমেশ গোয়েঙ্কা**

নিয়ামতপুর, পো ঃ সীতারামপুর,
জেলা - বর্ধমান

# একুশের নির্বাচনে বিজেপিকেই বরণ করবে বঙ্গবাসী

**ডাঃ আর এন দাস**

আমি রাজনীতিবিদ বা গণৎকার নই। সাধারণ বুদ্ধিতে অনুমান করতে পারি পশ্চিমবঙ্গের ভয়ংকর ভবিষ্যৎ। মমতা তৃতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলে, অল্পদিনেই পশ্চিমবঙ্গ 'গ্রেটার বাঙ্গলা'য় পরিণত হবে। ক্যাডারবাহিনী ভিত্তিক মার্কসীয় আদর্শের সিপিএমকে উৎখাত করা, আদর্শহীন তৃণমূল দলটি ২৪.৬ মিলিয়ন (২৭ শতাংশ), সংখ্যালঘু ভোটের সাহায্যেই পুনরায় নবান্নে আসবে কি?

কংগ্রেস ছেড়ে ১৯৯৮ সালে ৩০বি, হরিশ মুখার্জি রোডে টিএমসি-র সূচনা করে মমতা ব্যানার্জির দল ২০১১-তে ১৮৪টি আসন পেয়ে সোনিয়া-কংগ্রেসের ৪২টি আসন নিয়ে ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের কুশাসনকে পরাস্ত করে জোট সরকার গড়েন। আজ জনগণের রায়, স্বৈরাচারী সিপিএমকেও হার মানিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি তার ১১ বছরের রাজত্বে। আইআইটি-ছাপযুক্ত দুঁদে পুলিশের সাহায্যে রাজনৈতিক হত্যাকে আত্মহত্যায় পরিণত করানোর দক্ষতাতে তিনি অদ্বিতীয়া। হেমতাবাদে বিজেপির দেবেন্দ্র রায় (২০২০), পুরুলিয়ার ১৮ বছরের ত্রিলোচন মাহাতোর (২০১৮), ৪ অক্টোবর, ২০২০-র, ব্যারাকপুরের মণীশ শুক্লার রাজনৈতিক খুনগুলিই তার প্রমাণ।

রাজ্যের নীতি-নির্ধারণে গ্রামবাসীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে, ১৯৭৩ সালে পঞ্চায়েত অ্যাক্ট লাগু হলে ১৯৭৮ সালে বামেরাই প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন করায়। গত ২০১৮-র নির্বাচনে ২০০৩ সালের ছাপ্পা ভোটের জনক বামেদের ১১ শতাংশকে ছাপিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ৩৪.৫ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত আসন টিএমসি জবরদখল করেছিল। দিদির বশংবদ পুলিশ ও প্রশাসন যথেষ্ট বাহুবল দেখালেও শ'খানেক রাজনৈতিক হত্যায় রঞ্জিত ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূলকে বহু জায়গায় ধরাশায়ী করে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছিল।

উত্তরপ্রদেশের ৮০টি, মহারাষ্ট্রের ৪৮টি আসনের পরেই পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসন লোকসভা নির্বাচনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদা তৃণমূলের কাণ্ডারি মুকুল রায় আজ রাজ্যে বিজেপির মুখ্য মুখ। অর্জুন সিংহ, সৌমিত্র খাঁ , অনুপম হাজরা বিজেপিতে শামিল হয়েছেন। লোকসভা নির্বাচন ২০১৯-এর পূর্বেই বহু তৃণমূলি বিজেপিতে যোগ দিতে চাইলে মমতা ব্যানার্জি তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, গাঁজাকেস, ধর্ষণ, চুরি ও ডাকাতির মামলা দিয়ে মুখ বন্ধ করেন। তবুও হাওয়া বুঝে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেদের ছোটো-বড়ো নেতা ও কর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

সীমান্তের শহর ও গ্রামে মুসলমান ভোটারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জনবিন্যাসের অসামঞ্জস্য দেশের অখণ্ডতাকে বিঘ্নিত করছে। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর সিপিএম, এখন টিএমসি বাংলাদেশি মুসলমানদের অবৈধ অনুপ্রবেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করছে শুধুমাত্র অমূল্য সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কারণে। বিজেপি যখন ২টি, টিএমসি ২০১৪-র লোকসভায় ৩৪টি আসন মুসলমান তোষণের কারণে পায়। সেটা ২০১৯-এর নির্বাচনে নেমে এসে ২২ হয় এবং বিজেপির হয় ১৮। তৃণমূলি হিংসা ও হত্যা না হলে অনায়াসে ২৪টি আসনে বিজেপি প্রথম হতো। বিজেপির প্রতি উদাসীন, স্বার্থান্বেষী ও আঁতেল- মার্কা, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি 'ভদ্দরলোকেরা' সর্বদাই বামঘেঁষা। রামায়ণ-মহাভারতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাওয়া বামুন-কায়েতদের দিয়ে মুসলমান ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই হয় না। বামেদের ও স্বার্থান্বেষী তৃণমূলের গড় — কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে আজ বিজেপি আজ শক্তি

বাড়িয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র ৬ মাস বাকি। সাত দশকের নির্বাচনে অবহেলিত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে 'অচ্ছুত দলিতরাই' আজ বিজেপিকে তৃণমূলিগুন্ডা মোকাবিলায় সাহায্য করবে। উত্তরবঙ্গ কোচ-রাজবংশী, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স ও দার্জিলিঙের গোর্খারা, ছোটোনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের, মেদিনীপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া,বাঁকুড়ার তফশিলি এবং জঙ্গলমহলের উপজাতি ও জনজাতিদের সম্মিলিত বাহিনীই বিজেপিকে তৃণমূল, কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় এনে দেবে।

'সমানাধিকারের' বুকুনি ঝাড়া বামনেতারা ৩৪ বছর এবং 'ন্যায্য-দাবির' মিথ্যা ফুলঝুরিতে তৃণমূলিরা ১১ বছর ভণ্ডামি করেই কাটিয়েছে। তৃণমূলে বা বামপার্টিতে ক'জন ছিল মহিলা, তফশিলি বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতা-নেত্রী? মোদীজীর দূরদৃষ্টিতে আজ মহিলাদের সর্বত্র ক্ষমতায়ন হয়েছে। দুর্গাশক্তিরা উড়াবে 'রাফেল'। 'আইএনএস বিক্রান্ত' চালাবে মহিলা নৌসেনারা। বিজেপির রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ নিজেই একজন ওবিসি। তাছাড়া, অনেক ছোটো-বড়ো নেতা নমঃশূদ্র, তফশিলি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের বিরোধিতা সত্ত্বেও আরএসএস কয়েক দশক পূর্বেই মাওবাদী অধ্যুষিত বাঁকুড়া পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম ও ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলমহলে এবং উত্তরবঙ্গের উপজাতি ও জনজাতিদের মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। তার ফল আজ বিজেপি ভোগ করেছে। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির যেখানে ২০ শতাংশ ভোটশেয়ার ছিল, সেটা ২০১৬-য় ১৭ শতাংশে নামলেও ২০১৮-তে ২৭ শতাংশে পৌঁছায়। বিজেপির এই উত্থানে চিন্তিত মমতা ব্যানার্জি জেলবন্দি দুর্ধর্ষ মাওনেতা ছত্রধর মাহাতোকে মুক্তি দিয়ে বিজেপি নেতাদের ভয় দেখানো, মামলা ও হত্যার পরিকল্পনা করছেন। মমতা ব্যানার্জি কট্টর মোদী বিরোধী হয়েও তাঁরই প্রকল্পগুলিতে 'কন্যাশ্রী' ও 'সবুজ সাথী' নাম দিয়ে জঙ্গলমহলের ওবিসি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। তৃণমূলের ভ্রষ্টনেতার দুর্নীতি,মুসলমান তোষণ, স্বজনপোষণ এবং আমলাতান্ত্রিক লালফিতার ফাঁসের জন্য জঙ্গলমহলেও জমি হারাচ্ছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানের পিছনে সবথেকে বড়ো কারণ অ-বিজেপি নেতাদের মুসলমান তোষণ। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এখন। কট্টর মুসলমান, তহ্বা সিদ্দিকি নিজেই বলেছেন, 'মমতার অত্যধিক মুসমান তোষণের জন্য আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে'। তাই অনুব্রত মণ্ডল বৈষ্ণবদের খোল-করতাল এবং মমতা ব্যানার্জি ৬০০০ পুরোহিতকে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনের প্রলোভন দেখাচ্ছেন। ওদিকে ৬০,০০০ ইমাম মাসিক ৩৫০০ টাকা বেতনে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজে হিন্দু নিধনের প্রতিজ্ঞা করছে।

পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্যে মুসলমানরা আজ এতটাই বেপরোয়া যে, হিন্দুনারী নির্যাতন ও হত্যা, হিন্দুজমিতে লাঙ্গল দেওয়া, হিন্দুবাড়ি জবর দখল করে হিন্দুদেরই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করছে। প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে, শহরে ও শহরতলীতে মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে হিন্দুরা আজ আতঙ্কিত। জঙ্গীপুরের বন্ধু পাল তাঁর ১৭ কাঠা জমিতে মসজিদের পরিকল্পনায় বাধা দিয়ে সপরিবারে খুন হলেও সংবাদমাধ্যম, পুলিশ ও প্রশাসন নিশ্চুপ থেকেছে। কলকাতা শহরের প্রতিটি মোড়ে মসজিদের ছড়াছড়ি, হাইকোর্টের আইন অমান্য করে উচ্চস্বরে মাইকের আজান, আল-আমিন মিশন ও আল-কায়দার খোলা জিহাদের ডাকে হিন্দুরা আজ ভীতসন্ত্রস্ত। সরস্বতী পূজা, রথযাত্রা বন্ধ, নবীদিবসের উদ্‌যাপন। বাংলার শিক্ষকের স্থানে, উর্দু-শিক্ষকের নিযুক্তিতে দাড়িভিটে রাজেস ও তাপসের মৃত্যু কি নিছকই ঘটনা?

**টিএমসি এখনও পুরোপুরি জেহাদি মুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করে আছে। যদিও ঠোঁটকাটা দিলীপ ঘোষের আলপটকা মন্তব্য আঁতেল বাঙ্গালিরা ঠিকভাবে নিতে পারছে না, তবুও সময়ের দাবিতে একুশের নির্বাচনে বিজেপিকেই বরণ করে নেবে বঙ্গবাসী।**

ভ্রষ্টনেতাদের তোলাবাজি, কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ, ধর্ষণ, খুন ও লোপাটেরই পরিবর্তন চায় জনগণ। শিক্ষা ও সংস্কৃতিবান বাঙ্গালি হিন্দুরা ২০১১ সালে মমতাকে যখন জেতায়, সেদিন রবীন্দ্রসংগীত ও দেশাত্মবোধক গানের মাদকতায় বামেদের অত্যাচার ভুলে গেছিল। একক ক্ষমতায় ২০১৬-তে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলকে আবার দাঁড় করিয়েছিলেন কিন্তু ২০১৯-এর নির্বাচন বলে দিয়েছিল, মিথ্যা উন্নয়নের রানি তৃণমূলনেত্রী আসলে তোলাবাজি ও তোষণনীতির প্রতীক, কংগ্রেসেরই 'বি-টিম'।

বাম জামানায় ৬৪ হাজার কলকারখানা বন্ধ ছিল। গ্রামেগঞ্জে রাজনীতিতে অসহায় মানুষ মমতার আঁচলে আশ্রয় পেতে চেয়েছিল। জনগণের আশা ছিল, মমতা ব্যানার্জি ইস্পাত, পেট্রোকেমিক্যাল ও অটোমোবাইল শিল্প এনে বিদেশি বিনিয়োগের সাহায্যে কর্মসংস্থান করে বাঙ্গালির বেকারিত্ব ঘোচাবেন। কিন্তু তেলেভাজা ও চপমুড়ি শিল্পের সঙ্গে মাফিয়া ও সিন্ডিকেটরাজ, ধর্ষণ, খুন, অপরহণকেও তিনি আজ কুটিরশিল্পে পরিণত করেছেন। সূর্যকান্তের কথায়, 'কাটমানি ফেরতের জন্য নবান্নে আলাদা কাউন্টার খুলুন। দুর্নীতিগ্রস্ত চাঁইদের আড়াল করতে, কাটমানি উদ্ধারে সরকার বলির পাঁঠা করতে চাইছেন পঞ্চায়েত কর্মীদের'। সিপিএমের হার্মাদরাই টিএমসি-র ছত্রছায়ায় এসেছিল একদিন নিজেদের বাঁচাতে। তারা যেভাবে সিপিএমকে জিতিয়েছিল ঠিক সেই পদ্ধতিতেই বিজেপি প্রার্থীদের খুন করে তৃণমূলকে জিতিয়ে দেবে। থানার 'ব্যাড-কপ ও গুড-কপের' মতো জনসভায় মমতা

ব্যানার্জি নিজের দলের ভ্রষ্টাচারী নেতাদের ভর্ৎসনা করে মন জিতে নবান্নের সিংহাসনে আবার বসার প্ল্যান করছেন।

মেদিনীপুরের নেতা শুভেন্দুর কথায়, সিপিএমকে যেমন ভেঙে ছিলাম, ঠিক তেমনি বিজেপিকেও ভাঙব। রথীন ঘোষের মতে, 'তোমার পথেই জনস্রোত বৃষ্টি হয়ে নামবে, তোমাকে থামাতে চাইছে যারা, তারাই এবার ভাঙবে'। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বামগুন্ডাদের সঙ্গে লড়াই করা তৃণমূলের সৎ নেতারা মমতা ও অভিষেকের স্বজনপোষণে ও দলের ভ্রষ্টাচারীদের দৌরাত্ম্যে আজ কোণঠাসা হয়ে আছেন। তৃণমূলের বহু একনিষ্ঠ কর্মী আজ বুকভরা বঞ্চনার শিকার হয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় দিন গুনছেন। তাঁরা বিজেপিতে আসার জন্য পথ চেয়ে আছেন।

বিদ্যুৎ মাশুল মকুব, স্বচ্ছ রেশন ব্যবস্থা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর বিরুদ্ধে বিজেপি নীরব-প্রতিবাদ আন্দোলন করছে। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি আজ ভূলুণ্ঠিত বিদেশি আক্রান্তদের অত্যাচারে। তাই শ্রীরাম আজ পশ্চিমবঙ্গে অচ্ছুত। রামধনু আজ রংধনু হয়েছে মুসলমানের ভয়ে। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি সরস্বতী শিশুমন্দির ও সারদা শিশুতীর্থগুলি বন্ধ করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অসংখ্য মাদ্রাসায় হিন্দুর পকেট কেটে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ঢালছেন।

বাম জামানায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দেখা যেত নানা অছিলায় ধরনা দিতে। তেমনি ২০১১ সাল থেকেই দেখা যাচ্ছে সেই 'বুদ্ধিবেচিরাই' এখন তৃণমূলের পদলেহনে ব্যস্ত। শুভ্রাপ্রসন্ন, শ্রীজাত, অপর্ণা, কবির সুমনরা বিজেপিকে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে ভাঙার দোষে দায়ী করছেন কিন্তু নিজেরা সেকুলার হয়ে সংখ্যালঘু-তোষণে ব্যস্ত। রামনবমীতে অস্ত্রের প্রদর্শনে তারা ভীত কিন্তু মহরমের দিন খোলা তলোয়ারের হুংকারে তারা নিশ্চিন্ত! পদুপিসি, বলিউডের খলনায়ক, শাহরুখকে 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার' করে সংখ্যালঘুদের মন জয় করেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় টিকিটি তাদের বাঁধা কোথায়?

মুকুল রায়ের মতো সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব কাজে লেগে পড়েছেন। অভিষেক-বিরোধী কোণঠাসা শুভেন্দুর মতো দাপুটে নেতার অন্তর্ভুক্তি নাকি সম্ভব হবে। প্রতিটি পাড়ায় যদি স্বচ্ছ, সংস্কৃতিবান ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা এগিয়ে আসছেন। এবার নিশ্চয় ফিরে আসবে বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যময় গৌরবের দিনগুলি। আজ সিদ্দিকুলা চৌধুরী ও ফিরহাদ হাকিমের নাম শুনলেই বাঙ্গালি হিন্দু 'সিঁদুরে মেঘ' দেখে। শোনা যাচ্ছে, আগামী নভেম্বরে টিএমসি-র কয়েকটি নক্ষত্র পতন ঘটবে। ভারতপ্রেমী মুসলমানরা বিজেপিতে ইতিমধ্যেই নাম লেখাতে শুরু করেছেন। এতদিনের ধাত্রী কংগ্রেসকে তারা ভোট নাও দিতে পারেন। আসাউদ্দিন ওয়েসি ময়দানে নামলে সিপিএম ও টিএমসি-র দিনও শেষ হয়ে যাবে! টিএমসি এখনও পুরোপুরি জেহাদি মুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করে আছে। যদিও ঠোঁটকাটা দিলীপ ঘোষের আলপট্‌কা মন্তব্য আঁতেল বাঙ্গালিরা ঠিকভাবে নিতে পারছে না, তবুও সময়ের দাবিতে একুশের নির্বাচনে বিজেপিকেই বরণ করে নেবে বঙ্গবাসী ▯

*দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—*

**SUNITA JHAWAR**
কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী
৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

**KISHAN JHAWAR**
উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি
বিজেপি

**Mobile : 9830050425**

**Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.**

**Phone : 2235-3641, 2235-6483**

54, Ezra Street, Block D-2
1st Floor
Kolkata - 700 001

# দিদির বোধোদয়, একুশে পরাজয়

**মণীন্দ্রনাথ সাহা**

মাননীয় পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণ দয়া করে আমাদের হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেন না। আপনারা বলতেই পারেন— 'মাটির পুতুলের আবার কী ক্ষমতা আছে, তাকে পুজো করে লাভ কী? পাকিস্তান-বাংলাদেশের কথা ছেড়েই দিলাম। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নামক সংস্কৃতির পীঠস্থানেও এক শ্রেণীর লোকেরা যখন হিন্দু দেব-দেবী ভাঙচুর করে, মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, দেবমূর্তি অপবিত্র করে, দেবালয়ে গোমাংস ঝুলিয়ে রাখে তবুও দেব-দেবীরা তাদের তো কোনো শাস্তি দেন না? তাহলে দেব-দেবীর ক্ষমতা বা মহিমা কী করে আমরা বুঝতে পারব?' কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের দেব-দেবীরা অন্য লোকগুলোর মতো 'ক্যাচ' করে ধড় থেকে মুণ্ড নামিয়ে দেন না বটে কিন্তু তাঁদের যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং মহিমা আছে সেটা সময় হলেই বোঝা যায়। সেই মহিমা অবশ্য সবাই চটজলদি বুঝতে পারেন না। কেউ তাড়াতাড়ি বোঝেন, কেউ একটু দেরিতে বোঝেন, কেউ বা বিপদে পড়লে বুঝতে পারেন আর কেউ কেউ 'ভোট' এগিয়ে এলে ভালো করে বুঝতে পারেন। তখন তারা দেব-দেবী এবং তাঁদের সেবাইতদের ভালো করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। জানি আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন না। তাহলে খুলেই বলি ব্যাপারটা।

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে আমাদের দিদি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন, 'গরিব পুরোহিত, দরিদ্র সনাতনী ব্রাহ্মণদের ১ হাজার টাকা করে পুরোহিত ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গোটা রাজ্যে এরকম আট হাজার পুরোহিতকে এই ভাতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি যাদের বাড়ি নেই, তাঁদের বাঙ্গলার আবাস যোজনায় বাড়িও দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেছেন— 'সনাতন ধর্মের জন্য তীর্থস্থান গড়ে দিতে অনুরোধ করেছেন অনেকেই। আমরা তার জন্য কোলাঘাটে জমি চিহ্নিত করেছি।' এর পরেই তিনি বলেছেন— 'আমরা ২০১১ সালেই একটি হিন্দি অ্যাকাডেমি গঠন করেছিলাম। আজ হিন্দি দিবসে হিন্দি অ্যাকাডেমি কমিটিও গঠন করছি। এছাড়াও দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমিও গঠন করা হবে' ইত্যাদি।

প্রশ্ন উঠেছে, দিদি কেন পুরোহিতদের জন্য এত দয়া প্রদর্শন করতে গেলেন? জানেনই তো আমাদের হয়ে দেব-দেবীর পুজো করে দেন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণরা। তাই তাঁদের দ্বারা দেব-দেবীর কাছে একটা বার্তা পাঠালেন দিদি, দেব-দেবীরা যেন দিদির প্রতি প্রসন্ন হন।

অপর দিকে দিদির এই ঘোষণার পর সাম্প্রদায়িক (ধর্মনিরপেক্ষীরা বলে থাকেন) বিজেপি দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ কী বলেছেন একটু জেনে নিন। তিনি বলেছেন— 'ভোটের জন্যই পুরোহিতদের উৎকোচ দিচ্ছেন মমতা।' তিনি আরও বলেছেন— 'ভোট বড়ো বালাই। এখন দরজায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। তাই হিন্দুত্বের আবেগের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা।' দিলীপ ঘোষ পালটা প্রশ্ন করেছেন— 'পুরোহিতদের কথা এতদিনে তাঁর মনে পড়ল? যখন লকডাউনে মন্দির

বন্ধ ছিল, পুজোপাঠ বন্ধ ছিল, পুরোহিতরা কষ্টে ছিলেন, তখন তো মনে পড়েনি?'

তিনি আরও একটি মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন--- 'এর আগে যখন মুখ্যমন্ত্রী ইমামদের জন্য ভাতা ঘোষণা করেছিলেন, তখন পুরোহিতদের কথা মনে পড়েনি কেন? এখন যেহেতু নির্বাচন সামনে, হিন্দু ভোট দরকার, তাই পুরোহিতদের উৎকোচ দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বুঝে গিয়েছেন, হিন্দুরা তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। তাই এখন এত তৎপরতা। কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ বোকা নন। তাঁরা সব বোঝেন, মানুষ ধরে ফেলেছেন।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে— 'এই আট হাজার পুরোহিত কি তৃণমূলের ক্যাডার? একুশের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই হিন্দুভোট নিজেদের দিকে টানতে তৃণমূলের এই কৌশল। তিনি আট হাজার পুরোহিতের কথা বলেছেন। গোটা রাজ্যে এই সংখ্যাটা আট হাজার না আট লক্ষ। এর কী কোনো সার্ভে করা হয়েছে? পুরোহিত ভাতার নামে তৃণমূলের ক্যাডারদের টাকা পাইয়ে দেবেন। বাড়ি দেওয়ার নামে কাটমানি তোলা হবে।' বুঝুন একবার।

দিলীপ ঘোষ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যে যাই বলুন না কেন, আমি কিন্তু তাঁদের কথা বিশ্বাস করি না। কারণ আমি দিদিঅন্ত প্রাণ। দিদি যা করছেন, যা বলছেন তা আমি চোখ বুজে বিশ্বাস করি। সাম্প্রদায়িক দলের লোকেরা কে কী বললো তা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানেন? এ রাজ্যে কিছু ঠোঁটকাটা ভোটার আছে যারা আমফানের মতো দুর্যোগে, করোনার মতো মহামারীতে সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আর তৃণমূলের লোকেরা তা লুঠ করে নিচ্ছেন তা দেখে তারা দিলীপ ঘোষদের কথা এখন বিশ্বাস করলেও দিদির কথাকে কিছুতেই আর বিশ্বাস করতে চায় না। এই তো, সেদিন রাস্তায় এক ভদ্রলোক আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন— 'দিদির কথা শুনেছেন?' উত্তরে বললাম— 'হ্যাঁ শুনেছি।' তখন তিনি প্রাণ খুলে মনের ঝাল ঝেড়ে দিলেন। তিনি তখন একের পর এক দিদির কথা বলে চললেন। 'এতদিনে পুরোহিতদের কথা মনে পড়ল দিদির। দুবৃত্ত বামফ্রন্টকে আমরা সবাই মিলে সরিয়ে দিদিকে ক্ষমতায় বসালাম খুব বিশ্বাস করে। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় বসেই তোষণ শুরু করলেন। হিজাব পরলেন, নমাজ পড়লেন, ইফতার পার্টিতে যোগ দিলেন, ইমাম-মোয়াজ্জেমদের ভাতা দিলেন, খারিজি মাদ্রাসা নামক সন্ত্রাসী তৈরির কারখানাগুলিকে স্বীকৃতি দিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে দিদি এরাজ্যে কেউ রামনাম করলে গাড়ি থেকে নেমে তাকে মারতে ছুটে গেলেন। যখন বুঝলেন কাজটা ভালো হয়নি তখন দুর্গামাতার পায়ে ধরতে লাগলেন। এছাড়া বাংলা বাদ দিয়ে আরবি শব্দ আউড়াতে লাগলেন। যেমন— ইনসাফ, মেহেরবান, মোনাজাত ইত্যাদি আরও অনেক শব্দ। তিনি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যে একের পর এক হিন্দু কন্যারা বিধর্মীদের দ্বারা ধর্ষিতা হতে লাগলেন। কিন্তু পুলিশ ধর্ষকদের ধরে না। চাপে পড়ে এক ধর্ষককে ধরার অপরাধে দময়ন্তী সেন নামে এক দক্ষ মহিলা পুলিশ অফিসারকে শাস্তি দিয়ে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। দেশি-বিদেশি সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস চালানোর মক্কা হয়ে উঠল এই পশ্চিমবঙ্গ। যেখানে সেখানে বোমা বন্দুকের কারখানা বড়ে উঠল। কিন্তু তিনি চুপ করে মজা দেখতে লাগলেন। এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা যতই অপকর্ম করুক পুলিশ কাউকেই ধরা তো দূরের কথা দেখতেই পায় না। যদিও-বা কেউ ধরা পড়ে, আদালতে গেলেই জামিন পেয়ে যায়।'

এ সমস্ত প্রসঙ্গ উঠাতে একবার তিনি বলেই ফেললেন— 'দুধেল গোরুর লাথি খেতে তিনি প্রস্তুত।' তাই বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, এখন পুরোহিত ভাতা দেওয়া হচ্ছে কেন? দুধেল গোরু নিয়েই থাকুন।'

আমি যতই তাঁকে বুঝানোর ও থামানোর চেষ্টা করি, তিনি ততই আমার উপর রেগে যান। আমি বললাম, 'দেখুন আমাদের দিদি গান করেন, কবিতা আবৃত্তি করেন, ছবি আঁকেন, বই লিখেন— এরকম মুখ্যমন্ত্রী আগে কোনোদিন আমরা পাইনি। আপনি হয়তো জানেন না সে দিদির আঁকা ছবি কোটি টাকায় বিক্রি হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই ছুঁয়ে ফেলেছেন। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নজরুল প্রমুখ মহাপুরুষের কথা 'কোট' করেন। সেই মানুষকে আমরা যেন ভুল না বুঝি।' যদিও ক্যানিং, ধুলাগড় ও আরও কয়েক জায়গায় তাঁর দুধেল গোরুরা শয়ে শয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, লুঠপাট করেছে, নারী নির্যাতন করেছে, তবুও বলব তিনি আমার কাছে সত্যিকারের মমতাময়ী দিদি।

কিন্তু কী বলব জানেন, ভদ্রলোক আমার কথা শুনতেই চান না। শেষে আমাকেই চোখ রাঙিয়ে বলে গেলেন— 'দেখে নেবেন, দেখে নেবেন, দিদির বোধোদয় হলেও একুশে নিশ্চয়ই পরাজয় হবেই, হতেই হবে।' ▯

**এতদিনে পুরোহিতদের কথা মনে পড়ল দিদির। বামফ্রন্টকে সরিয়ে মানুষ দিদিকে ক্ষমতায় বসালো বিশ্বাস করে। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় বসেই তোষণ শুরু করলেন। হিজাব পরলেন, নমাজ পড়লেন, ইফতার পার্টিতে যোগ দিলেন, ইমাম-মোয়াজ্জেমদের ভাতা দিলেন, খারিজি মাদ্রাসা নামক সন্ত্রাসী তৈরির কারখানাগুলিকে স্বীকৃতি দিলেন। এখন বুঝলেন শুধু দুধেল গোরুর লাথি খেয়ে কাজ হবে না। তাই পুরোহিতদের ধরে বাঁচার চেষ্টা।**

# বাংলাদেশ-সৌদি সম্পর্কে টানাপোড়েন, চীন ঘনিষ্ঠতাই কি কারণ ?

**ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।।** সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরব ও বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রবল বিরোধিতা করে সৌদি, যা অব্যাহত ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়া পর্যন্ত। এর পরই পরিস্থিতি পালটে যায়। সৌদি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বন্ধুতে পরিণত হয়।

সম্প্রতি বড়ো ব্যবধান তৈরি হয়েছে দু'দেশের মধ্যে। নানা ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর একের পর এক চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে সৌদি আরব। বিষয়টি ভাবিয়ে তুলছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের। সন্দেহ করা হচ্ছে, রিয়াধের আচরণে এই আকস্মিক পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মেরুকরণ ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। যদিও বিশ্লেষকদের একটি অংশ বলছেন, স্থানীয় শ্রমবাজার সৌদিকরণের পরিকল্পনা থেকেই ঢাকার ওপর নিয়মিত চাপ বাড়িয়ে চলেছে রিয়াধ।

মাসখানেক আগে সৌদি আরব আকস্মিকভাবেই ৫৪ হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে চাপ দেওয়া শুরু করলে সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিষয়টি সামনে চলে আসে। এসব রোহিঙ্গা ১৯৭৭ সালে সৌদি যাওয়া শুরু করে। রোহিঙ্গাদের দুর্দশা দেখে তৎকালীন বাদশাহ তাদের সৌদি আরব নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেখানে তাদের সন্তানসন্ততিও জন্মগ্রহণ করে, যারা পুরোপুরি আরবিভাষী। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ বর্তমানে নির্যাতনের মুখে পালিয়ে আসা প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে, সেহেতু সুযোগ বুঝে আরো ৫৪ হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে সৌদি আরব।

এ বিষয়ে কূটনীতিকরা বলেন, এখন সৌদি আরবের সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে গেলেই ৫৪ হাজার রোহিঙ্গার বিষয়টি জানাতে চায় তারা। আমরা এরই মধ্যে পরিষ্কার করেছি, তাদের কাছে যদি বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকে বা কোনো সময়ে থেকে থাকে, তবে তাদের ট্রাভেল ডকুমেন্ট তৈরি করে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু এর বাইরে কাউকে আনবে না বাংলাদেশ। এছাড়া কাউকে বাংলাদেশি হিসেবে যদি চিহ্নিত করে, তবে যাচাই-বাছাই করে তাকে ফেরত নিয়ে আসবে বাংলাদেশ। সৌদি থেকে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি তারাই দেখবে।

**সৌদি আরবের বর্তমান এই বৈরী আচরণের পেছনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চীন-ঘনিষ্ঠতা কাজ করছে, এমন সন্দেহের অবকাশ তৈরি করেছে ইসলামাবাদ-রিয়াধের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। আবার সৌদি আরব বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করছে।**

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো শ্রমবাজার। সৌদিতে বর্তমানে ২২ লক্ষের বেশি বাংলাদেশি বসবাস করছেন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, করোনার কারণে উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধ হওয়ার আগে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) সৌদি গেছেন ১ লক্ষ ৮১ হাজার ২১৮ বাংলাদেশি কর্মী। একই সঙ্গে এই দেশটিই আবার বাংলাদেশে রেমিট্যান্সেরও সবচেয়ে বড়ো উৎস। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, গত অর্থবছরে (২০১৯-২০) সৌদি থেকে রেকর্ড ৪০১ দশমিক ৫১ কোটি ডলারের বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন সেদেশে প্রবাসীরা। করোনার মধ্যেও চলতি অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসেই (জুলাই-আগস্ট) দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ১০৮ কোটি ডলারের বেশি।

বর্তমানে ঢাকার সঙ্গে রিয়াধের আচরণ এক প্রকার বৈরি হয়ে উঠেছে। সৌদি আরবে অবস্থানরত অবৈধ ও অনথিভুক্ত বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে ঢাকার ওপর চাপ দিয়ে চলেছে দেশটি। রিয়াধে নিযুক্ত বাংলাদেশি দূতাবাসের আশঙ্কা, সৌদি আরব থেকে প্রথম ধাপে বিতাড়িত হতে পারে ৫-১০ লক্ষ বাংলাদেশি। অন্যদিকে সৌদিতে চার

দশক ধরে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট দেওয়ার জন্যও ঢাকাকে চাপ দিচ্ছে রিয়াধ।

অথচ ঢাকা ও রিয়াধের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক কিছুদিন আগেও বেশ উষ্ণ ছিল। গত বছরই দুই দেশের মধ্যে এক সামরিক সমঝোতা সই হয়। এর পর পরই সৌদি মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য-সহ ৩৪ জনের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে পাঠান যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। দুই দেশের বৈঠক শেষে প্রতিশ্রুতি আসে বড়ো বিনিয়োগেরও। প্রতিনিধি দলকে ২৯ প্রকল্পে ৩ হাজার ১০৪ কোটি টাকা বিনিয়োগেরও প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ।

সৌদি আরবের বর্তমান এ বৈরী আচরণের পেছনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চীন-ঘনিষ্ঠতা কাজ করছে, এমন সন্দেহের অবকাশ তৈরি করেছে ইসলামাবাদ-রিয়াধের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান গত বছর পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। ওই সময়ে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে বেশকিছু বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি সই হয়। কিন্তু এর ১৮ মাসের মাথায় দুই দেশের সম্পর্কে চিড় ধরে। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের পক্ষে অবস্থান নেয় সৌদি আরব। বিষয়টিতে পাকিস্তানে এক ধরনের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অন্যদিকে ইসলামাবাদ-রিয়াধ সম্পর্কের অবনতির পেছনে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধের কারণে সৃষ্ট মেরুকরণকে দায়ী করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা।

তাদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো মিত্র সৌদি আরব। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়াকেন্দ্রিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতই গুরুত্ব পায় সবচেয়ে বেশি। এছাড়া চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে বৈরিতা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি রাখতেই কাশ্মীর ইস্যুতে চীন-ঘনিষ্ঠ দেশ পাকিস্তানের বদলে ভারতকে সমর্থন দিয়েছে রিয়াধ।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক শীতল হয়ে ওঠার পেছনে চীনঘনিষ্ঠতা কাজ করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে বৈরিতার পেছনে রিয়াধের স্থানীয় শ্রমবাজার সৌদিকরণ পরিকল্পনাই দায়ী বলে মনে করছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, দেশটি সৌদিকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন তার নিজস্ব মানুষগুলোকে কাজে লাগাতে গেলে প্রথমে যারা স্থানগুলো ধরে বসে রয়েছে, তাদের সেখান থেকে সরাতে হবে। আর বাংলাদেশ ও সৌদি সম্পর্ক মূলত শ্রমনির্ভর। এ কারণেই এখানে চাপ অনুভূত হচ্ছে। সৌদি আরব আগে ইসলামিক সংহতির ভিত্তিতে মুসলমান দেশগুলোর সঙ্গে যে সম্পর্ক বজায় রাখতো, সেখান থেকে অনেক সরে এসেছে। তারা এখন ভারত, ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছে। ইরান-সহ কয়েকটি মুসলমান দেশের সঙ্গেও সৌদি আরবের বিরূপ সম্পর্ক বিরাজ করছে।

২০১৫ সালে সৌদি আরবের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। বর্তমানে সৌদি নাগরিকদের মধ্যে বেকারত্ব বাড়ছে। এ কারণে দেশটিতে অবস্থানরত অন্য দেশের বৈধ-অবৈধ নাগরিকদের বিতাড়নের পরিকল্পনা হাতে নেয় রিয়াধ। এ কারণে সৌদি আরব এখন আর সেখানে অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বৈধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশি দূতাবাসের আশঙ্কা, এবার সেখান থেকে ৫-১০ লক্ষ বাংলাদেশিকে বিতাড়ন করা হতে পারে। রিয়াধের বাংলাদেশি দূতাবাস থেকে বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, চলতি বছরের মার্চের শেষে রিয়াধের বাংলাদেশি দূতাবাস জানিয়েছে, সৌদি আরব বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করছে। শুরুতে অবৈধ ও অনথিভুক্ত বাংলাদেশিদের নিয়ে আসতে বলেছে। তারপর হয়তো বৈধভাবে যেসব বাংলাদেশি রয়েছেন, বিভিন্ন উপায়ে তাদের সৌদিতে টিকে থাকা কঠিন করে দেবে সৌদি। এর উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে। সেখানে মিশরের নাগরিকদের জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তাদের অনেকেই সৌদি আরব ছেড়ে চলে গিয়েছে। দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যাদের পাসপোর্ট নেই বা কোনো ট্রাভেল ডকুমেন্ট নেই, তাদের কীভাবে এ নথিগুলো দেওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

ধারণা করা হচ্ছে, অবৈধভাবে অবস্থানরত ৫-১০ লক্ষ বাংলাদেশিকে হয়তো এখনই বিতাড়ন করবে না সৌদি আরব সরকার। তবে তিন-পাঁচ বছরের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে দেশটি। সৌদি আরবের ভিশন-২০৩০ অনুযায়ী, সেখানে শ্রমবাজারের ৭০ শতাংশ পূরণ করা হবে স্থানীয় নাগরিকদের দিয়ে। এজন্য অন্যান্য দেশ থেকে আসা শ্রমিকদের ক্রমান্বয়ে ছাঁটাই করে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এজন্য এরই মধ্যে বিদেশি নাগরিকদের জন্য পরিস্থিতি প্রতিকূল করে তোলা শুরু করে দিয়েছে সৌদি সরকার। বিশেষ করে করের ক্ষেত্রে। সৌদি আরবে বিদেশি কর্মীদের পরিবারের অবস্থানের ওপর মাসিক চার্জ আরোপ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইকামার ফিও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে টিউশন ফি বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি করও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এরই মধ্যে ১১ মিশরীয়-সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা সৌদি আরব ছেড়ে চলে গেছে। সৌদি ত্যাগের প্রক্রিয়ায় রয়েছে আরো অনেক বিদেশি। তাদের বেশির ভাগই পেশাজীবী।

সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধ শ্রমিকদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে সৌদি পুলিশ। এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশের ১০ লক্ষের বেশি কর্মীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসীকল্যাণ ডেস্কের তথ্য বলছে, গত জানুয়ারিতে ৩ হাজার ৬৩৫ জন এবং ফেব্রুয়ারিতে ১ হাজার ৯৫১ জন সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছেন। আর কোভিড-১৯-এর জন্য ফ্লাইট বন্ধ হওয়ার পর থেকে বিশেষ ফ্লাইট সৌদি থেকে শ্রমিকরা ফিরতে শুরু করেন। চলতি বছর ১ এপ্রিল থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছেন ৩৬ হাজার ৩৪০ জন। এর মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে আউট পাস নিয়ে ফিরেছেন ৭ হাজার ৯৯৯ জন। বাকিরা ফিরেছেন কাজ হারিয়ে। এর আগে ২০১৯ সালে সৌদি আরব থেকে একবারে ফিরে এসেছিলেন ২৫ হাজার ৭৮৯ জন বাংলাদেশি। □

# এক বছর পর জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ

**গৌতম কুমার মণ্ডল**

সংসদের উভয় কক্ষে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বিলোপ হয়ে যাবার পর তাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেন ২০১৯-এর ৯ আগস্ট। তারপর থেকেই জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখের অন্যভাবে পথচলা শুরু হয়। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা গোটা জম্মু ও কাশ্মীরকে বাকি দেশ থেকে প্রায় আলাদা করে রেখেছিল। ৩৭০ ধারা অনুযায়ী এ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাই ছিল অন্যরকম। ৩৫-এ ধারা অনুযায়ী সে রাজ্যে কাশ্মীরি ছাড়া অন্য কেউ জমি কিনতে পারত না। এমনকী কাশ্মীর ছাড়া দেশের অন্য কোনো রাজ্যের মেয়ের সেখানে বিয়ে হলে তার সেখানে সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার থাকত না। তবে পাকিস্তানি মেয়ের কাশ্মীরে বিয়ে হলে তার সেখানে সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার থাকত। এসব বৈষম্য ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা কাশ্মীরকে সারা ভারতের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। কাশ্মীর ভারতের হয়েও যেন ভারতের নয় এরকম একটি ব্যবস্থা স্বাধীনতার পর থেকেই চলছিল। মোদী-২ সরকার দৃঢ় হাতে সে ব্যবস্থার অবসান ঘটায়। শুধু দুটি ধারার বিলোপ সাধনই নয়, একই সঙ্গে সরকার 'The Jammu and Kashmir Reorganisation Act-1019' আইনও সংসদে পাশ করিয়ে নেয়। এই আইন রাজ্যসভায় পাশ হয় গত বছরের ৫ আগস্ট, লোকসভায় পাশ হয় তার পরের দিন ৬ আগস্ট এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ৯ আগস্ট। নতুন আইন মোতাবেক জম্মু ও কাশ্মীরকে দুটি নতুন কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে ভাগ করা হয়। একটি জম্মু ও কাশ্মীর, অন্যটি লাদাখ। এই আইন কার্যকরী হয়ে ওঠে ২০১৯-এর ৩১ অক্টোবর থেকে। তাই নতুন রাজ্যদুটির এক বছর পথ চলা হয়ে গেল।

মোদী-২ সরকার যেন প্রথম থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে সংবিধানের অস্থায়ী ওই দুটি ধারা তুলে দেওয়া হবে। কারণ রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি মনে করে এই দুটি ধারার জন্যই কাশ্মীরে উগ্রপন্থার রমরমা। এই দুটি ধারার সুযোগ নিয়ে হুরিয়ত কনফারেন্সের কোটিপতি নেতারা, ন্যাশনাল কনফারেন্স বা পিডিপি-র মতো পারিবারিক দলগুলো এমনকী কংগ্রেস বা বামেরাও সেখানে ভারত বিরোধী জিগির জিইয়ে রাখে। কাশ্মীরের মানুষের মনে তথাকথিত স্বাধীনতার দাবি ও ভারত বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে রেখেই এই দলগুলো রাজনীতি করে। এই ধারা দুটি তুলে দিয়ে কাশ্মীরকে বাকি ভারতের সঙ্গে এক করতে পারলেই কাশ্মীরের সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়ে যায়। এটাই বিজেপি-র রাজনৈতিক চিন্তন ছিল। তাই গত লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের নির্বাচনী ইস্তেহারেও দল এই কথা বলেছিল। নির্বাচনে বিপুল জয়লাভ করেও সে কাজ না করতে পারলে দেশবাসীর প্রতি তারা সুবিচার করত না। তাই সরকারের একেবারে প্রথম বছরেই প্রায় স্থায়ী হতে বসা অস্থায়ী ধারাদুটি তুলে দিয়ে এবং নতুন ভাবে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ-কে সাজিয়ে বিজেপি দেশবাসীর প্রতি দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছে।

বিজেপি সুবিচার করেছে লাদাখবাসীর প্রতিও। স্বাধীনতার পর থেকেই লাদাখ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে পৃথক হয়ে আলাদা কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হওয়ার দাবি জানাতে থাকে। ১৯৫৫ সালে এই দাবি প্রথম ওঠে। আসলে কাশ্মীর কেন্দ্রিক রাজনীতিতে লাদাখ প্রথম থেকেই ছিল অবহেলিত। লাদাখ যেন কাশ্মীরের কলোনি হয়ে উঠেছিল। আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্মীয় রীতিনীতির দিক দিয়ে লাদাখ কাশ্মীর থেকে পুরোপুরি আলাদা। তাই তাদের এই দাবি অযৌক্তিক ছিল না। এই দাবিকে স্বীকৃতি দিতেই পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশকে রাজনৈতিক ভাবে দু' টুকরো করা হলো। লাদাখ হয়ে উঠল পুরোপুরি কেন্দ্র শাসিত রাজ্য। জম্মু ও কাশ্মীর হলো কেন্দ্র শাসিত রাজ্য কিন্তু সেখানে বিধানসভা থাকবে। অর্থাৎ অনেকটা

জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লির মতো ব্যবস্থা। ভোট করানোর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলে ও নতুন বিধানসভার কেন্দ্রগুলি সুবিন্যস্ত হলেই সেখানে নির্বাচন হবে। এভাবেই সেখানে নতুন করে বিধানসভা গঠিত হবে, নতুন মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেবেন; কিন্তু সে বিধানসভার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো নতুন ব্যবস্থায় জম্মু ,কাশ্মীর ও লাদাখ কেমন আছে? আমরা কাশ্মীর থেকে বহু দূরে বাস করি। সেখানকার খবরাখবর আমরা সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি। আমরা যারা বেড়ানোর জন্য কাশ্মীর যেতাম তাদেরও এখন মন্দ কপাল। করোনার কবল থেকে মুক্ত হয়ে ভ্রমণ ব্যবসা আবার কখন থেকে চালু হবে কেউ জানেন না। তবে এখন বেশ কিছুদিন ধরে আমরা কাশ্মীর থেকে সেরকম হিংসার কোনো খবর পাইনি। হিংসা বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি পুলিশ বা সেনাকে ঘিরে ধরে ভাড়া করা যুবকদের পাথর ছোঁড়া, সেনারও প্রত্যাঘাত হানা, মাঝে মধ্যেই বনধ, হরতাল, গুলি বোমার লড়াই, সাধারণ মানুষের মৃত্যু, পুলিশ বা সেনার মৃত্যু, চাপা সন্ত্রাস, উগ্রপন্থীদের লোকালয়ে আশ্রয় নেওয়া ও তা জেনে সেনার অভিযান, তার জন্য আবার খুনজখম— এইসব। এসবের সঙ্গে ছিল নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস। কাশ্মীরের পরিচিতি যেন এসবকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। ফলে ডুবতে বসেছিল কাশ্মীরের পর্যটন শিল্প— যার জন্য কাশ্মীরের এত নামডাক। এছাড়া কাশ্মীরের আপেল ও অন্যান্য ফলের ব্যবসার মুনাফা লুঠছিল মুষ্টিমেয় কিছু দালাল ও ফড়ে জাতীয় লোকজন। আসল চাষিরা দাম পাচ্ছিলেন না। কাশ্মীরের হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরাও উপযুক্ত দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। উন্নয়ন বলে কোনো কর্মকাণ্ড কাশ্মীরে ছিল না বললেই চলে। কারণ লাগাতার হিংসা ও অশান্তির মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ সম্ভব নয়। সরকারি অর্থে উন্নয়নের প্রাথমিক শর্তই হলো এলাকার শান্তি। কাশ্মীরে তা ছিল না। তাই বলে কী সরকারি অর্থ সেখানে যাচ্ছিল না? তা নয়। সরকারি অর্থের ব্যাপক দুর্নীতি কাশ্মীরে চলত এবং তা প্রকারান্তরে পৌঁছে যেত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের হাতে। ফলে স্বাধীনতার পর থেকেই কাশ্মীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারত বিরোধী শক্তির ও পারিবারিকভাবে রাজনীতিকেই যারা পেশা করে নিয়েছিলেন তাদের করে কর্মে খাওয়ার জায়গা। কাশ্মীরে যে এরকমই হতে চলেছে তা প্রথম আঁচ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। কিন্তু তাঁর কী পরিণতি হয়েছিল আমরা সবাই জানি। সুতরাং কাশ্মীরের পুনর্গঠনে ও ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা প্রত্যাহারে কিছু মানুষের যে কোমর ভেঙে গিয়েছে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। নইলে ৩৭০ ধারা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ফারুক আবদুল্লা সাহেব চীনের সাহায্য চান।

জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হওয়ার পর থেকে সে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এই নতুন পঞ্চায়েত যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে যে কাজ করে চলেছে তা বোঝা যায় রাষ্ট্রীয় স্তরের বিচারে এ রাজ্যের তিনটি পঞ্চায়েত গ্রামীণ স্তরে কাজের জন্য দীন দয়াল উপাধ্যায় সশক্তিকরণ পুরস্কার-২০২০ লাভ করেছে। রাজৌরির দুটি এবং পুলয়ামার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই পুরস্কার লাভ করেছে। গ্রামীণ সড়ক

নির্মাণ, গ্রামীণ আবাস যোজনার কাজ, নল বাহিত পানীয় জল সরবরাহ, স্বচ্ছতার কাজ, কৃষি পরিকাঠামো থেকে গ্রামীণ বিদ্যুৎ উন্নয়নের কাজে কাশ্মীরের পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে।

এছাড়া কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে সড়কপথ, ব্রিজ নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ, শিল্প পরিকাঠামো তৈরি, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। জম্মুর বিজয়পুরে ৭৫০ শয্যার এআইএমএস পর্যায়ের হাসপাতাল নির্মাণের কাজ চলছে। ২০২২-এর আগস্ট মাসের মধ্যেই তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এতদিন জম্মুর প্রতি যে অবহেলা করা হয়েছে, এখন তা হচ্ছে না। আবার পাকিস্তান বর্ডার থেকে ৬ কিমি দূরত্বের মধ্যে যারা বাস করেন তাদের জন্য সরকারি চাকরিতে চার শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নতুন প্রশাসন নিয়েছে। এভাবে জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজে বিপুল অর্থ নিয়ে কাজে নেমে পড়েছে নতুন রাজ্য। এই অর্থে কোনোভাবেই ভাগ বসানো যাচ্ছে না; পারিবারিক রাজ্যপাট কীভাবে চলবে এই ভাবনাতেই ঘুম ছুটে গেছে পারিবারিক দলগুলির। আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে এঁরা এখন চিন্তা করছেন পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য কার সাহায্য নেওয়া যায়— পাকিস্তানের না চীনের।

লাদাখ--- নবগঠিত এই রাজ্যটি ভৌগোলিক দিক থেকে সারা দেশের বৃহত্তম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। এই রাজ্যের দুটি জেলা লেহ ও কার্গিল। লেহ ভৌগোলিকভাবে সারা দেশের বড়ো জেলাগুলির একটি। লেহ্ শহর লাদাখের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র বা রাজধানী। পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে অবহেলিত ছিল লাদাখ। অথচ পাকিস্তান ও চীন সীমান্তে থাকার কারণে লাদাখের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল। একদিকে হিমালয়ের সৌন্দর্য অন্যদিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির কারণে লাদাখ সারা বিশ্বের টুরিস্টদের আকর্ষণ করে। কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। লাদাখের বহু জায়গা এই সেদিন পর্যন্ত বিদ্যুৎবিহীন ছিল। ২০১৯-এ স্বাধীনতার ৭২ বছর পর লেহ এবং কার্গিল যুক্ত হয়েছে জাতীয় পাওয়ার গ্রিডের সঙ্গে। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়ার পর লাদাখের দূরদূরান্তের পাহাড়ি গ্রামগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ। লাদাখের ফিয়াং-এ সিন্ধু নদীর জল কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠেছে এক বৃহৎ জল বিদ্যুৎ প্রকল্প। জাতীয় সৌর শক্তি নিগম (The Solar Energy Corporation of India– SCEI) লেহ (5 G.W.) এবং কার্গিলে (2.5 G.W.) গড়ে তুলছে মোট 7.5 GW (Giga Watt) Solar Power Project– যা এ বিষয়ে ভারতের বৃহত্তম উদ্যোগ।

বিদ্যুৎ ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে বড়ো কাজ চলছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লেহ-তে কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয় এবং Central Buddhist Studies Cernte গড়ে তোলা। কয়েক হাজার লাদাখি যুবক প্রতি বছর ভারতের উত্তরের রাজ্যগুলিতে পাড়ি দেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে সে সমস্যার সমাধান হবে।

২০২০-র মাঝামাঝি লাদাখের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার। ধর্মগত ভাবে এখানে অমুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। এদের মধ্যে প্রধান হলো বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ। পূর্বতন রাজ্যে ধর্মগত ভাবে জনসংখ্যার এই বড়ো অংশ ছিল অবহেলার শিকার। সে কারণেই মাঝে মধ্যে ইসলাম ও বৌদ্ধদের মধ্যে সংঘাতও দেখা দিত। মূল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে কাজ করতে পারলেই সংঘাতের পরিবেশ যে থাকবে না তা নতুন প্রশাসন জেনে গেছে। লাদাখি যুবকদের শিক্ষা ও চাকরির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। লাদাখের হস্তশিল্পের কথা সারা বিশ্ব জানে। এ ক্ষেত্রেও শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে নানা ভাবে। স্থানীয় স্তরে কাজ করছে লাদাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (LAHDC)। লেহ্ ও কার্গিল এই দুই জেলার জন্য এরূপ দুটো কাউন্সিল কাজ করছে। গত ২২ অক্টোবর ২৬ আসনের লেহ্-র উন্নয়ন পর্ষদের নির্বাচন হয়ে গেল। জম্মু-কার্গিল-লেহ্ জাতীয় সড়ক এখন মজবুত ও প্রশস্ত। প্রচুর কাজ হচ্ছে গ্রাম সড়ক যোজনায়। চীন সীমান্তের কারণে লাদাখে সড়ক পথ নির্মাণের কাজে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি কাজের খতিয়ান দেওয়া এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। মূলকথা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও শুভচিন্তা। সরকারি পদে বসে থেকে কারো মন যদি পড়ে থাকে অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনে, তাহলে জলের মতো অর্থ খরচ হতে পারে, কিন্তু কাজ কিছু হয় না। এখন সেই অবস্থা আর নেই। গত এক বছরে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে প্রকৃত উন্নয়নের কাজ চলছে। সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে। প্রায় বন্ধ হয়েছে আর্থিক দুর্নীতি। সরকারি অর্থে ভাগ বসানো যাচ্ছে না বলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো হতাশ। এদের সঙ্গে উপত্যকার আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর যে মিলমিশ ও সখ্যতা, তাতে আর কোনো লাভ হচ্ছে না। পাক-মদত পুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরাও বুঝে গিয়েছে অবস্থা সুবিধের নয়। তাই গত এক বছরে কমেছে হিংসা। যদিও এক বছর খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু তার মধ্যেই দিশা দেখাচ্ছে জম্মু,কাশ্মীর ও লাদাখ। □

## শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক বিজয় পাতরের পিতৃদেব অমূল্য কুমার পাতর গত ৩ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

# অযোধ্যায় রামমন্দির ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ

**কুণাল চট্টোপাধ্যায়**

আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীর দু'হাজার বছরের ইতিহাসে বর্তমান ২০২০ সালটা বৃহত্তম মহামারীর কাল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে। গুটিকয় হাতে গোনা দেশ ছাড়া এমন কোনো দেশ নেই যারা এই অদৃশ্য মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত আতঙ্কে ভীত হয়নি। মহাকালের বিচারে এই বছরটা যেন ইট চাপা ঘাসের মতো থেকে যাবে।

এই ঘটনার বাইরে এই বছরের যে দুটি ঘটনা ইতিমধ্যেই বিশেষ স্থান করে নিয়েছে সেগুলি হলো তুরস্ক ও ভারতবর্ষে দুটি ধর্মস্থানের নবকলেবর প্রাপ্তি। দুই ক্ষেত্রেই ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটল। একটি গোড়ায় যা ছিল না তাই হতে চলেছে, অন্যটি ফিরবে আদির টানে। সেই সঙ্গে মিলেছে বর্তমান কাঠামোর ভক্তদের ভক্তিভরে নবদেবালয় বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এখানে রয়েছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ভূমিকা।

৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টাইন শাসনকালে নির্মিত বিস্ময়কর স্থাপত্যকীর্তির গীর্জা 'আয়া সোফিয়া' ১৪৫৩-তে অটোমান রোমান শাসনকালে 'হাজিয়া সোফিয়া' মসজিদে রূপান্তরিত হয়, যেটি বিশ্বের আপামর পর্যটকদের কাছে ব্লু মস্ক নামে পরিচিত। ভ্রমণকারীদের কাছে যার হাতছানি প্রায় তাজমহলের মতোই অপ্রতিরোধ্য। আরও পরে ১৯৩৫-এ কামাল আতাতুর্ক পাশার হাতে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি মিউজিয়ামে পরিণত হয়। সযত্নে যথাসম্ভব রক্ষিত থাকে খ্রিস্টীয় ও ইসলামি স্থাপত্যের অমূল্য নিদর্শনগুলি।

কিন্তু তুরস্কের বর্তমান শাসক এদগোয়ার্নোর গুয়ার্তুমিতে ১০ জুলাই, ২০২০ সেখানকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় জানালো সেকুলার মিউজিয়ামকে ইসলামিক উপাসনাগার হতে হবে। প্রার্থনাকালে ঢাকা থাকবে অনিন্দ্য সুন্দর মেরি-যিশুর অবয়ব, নয় শতকের বহুমূল্য মাস্টারপিসগুলিও। সেই সময় বিধর্মীদের জন্য বন্ধ হবে দরজা। তুরস্কের বর্তমান শাসক প্রমাণ করলেন কামাল পাশা নামক প্রহ্লাদের দৈত্যকুলে কোনো স্থান নেই। একদিন 'সেকুলার' ভারতবর্ষে স্যাটানিক ভার্সেস নিষিদ্ধ হলেও তুরস্কে নিষিদ্ধ হয়নি। ভাবা যেতেই পারে আগামীদিনে তুরস্কও 'সেকুলার' ভারতের পথে হেঁটে রুশদির কিতাব নিষিদ্ধ করবে।

সেনজেন ভিসার মেয়াদকাল এখনো বজায় থাকার কারণে

ইজরায়েলের ভিসা পাওয়া অনেক সহজ ও সুলভ। তাই সেই সঙ্গে কায়রো আর ইস্তাম্বুলকেও জুড়েছিলাম। বসফরাসে ভাসা, সেই সঙ্গে ব্লু মস্ককে দু'চোখ ভরে দেখার সাধ দীর্ঘদিনের। সেই সঙ্গে সোক আরাবিকের পথে জেরুজালেমে হাঁটব, নীল নদের ক্রুজ সেরে চাঁদের আলোয় স্ফিংস দেখব। এই সব ভাবনায় জল ঢেলে দিল দুই ভাইরাস : করোনা ও এদগোয়ার্নো। আয়া শোফিয়ার শীলিত দেহের অমূল্য সৌন্দর্যায়ন ঢেকে বসানো হয়েছিল ইসলামের অলংকার। পুনর্মসজিদিকরণের পক্ষে উদ্ধত সওয়াল হতেই পারে, স্পেনে যখন মসজিদ ভেঙেছিলে তার বেলায়?

একথা ঠিক, ১৩৩৪-এর পর সার্বিয়া, বোসনিয়া, আলবানিয়া, এপিরাস, এশিয়া মাইনর, এগুলোকে অটোমান সাম্রাজ্য একত্রিত করেছিল। বেলগ্রেড ছুঁই ছুঁই। হাঙ্গেরি, ভিয়েনা, মাল্টা দখল কেবল সময়ের অপেক্ষা। ঠিক তখনই ক্যাথলিক পর্তুগাল এবং সঙ্গী এসপানিয়া রুদ্র রূপ ধারণ করেছিল। পোপ পঞ্চম নিকোলাস মন্তব্য করেছিলেন, 'The war waged by the Portugese was a savage one admittedly, but it was a question of wiping out Mohamedan Plague.' ফলে বলা যায় ইউরোপের বামিয়ানরা রক্ষা পেয়েছে।

অযোধ্যায় যেটা ঘটেছে সেটা পুনর্মন্দিরীকরণ। মধ্যিখানে কোনো মিউজিয়ামের গল্প নেই। ১৩৩৪ সালের তুলনায় মির বাকি নির্মিত সৌধটি সম্পদ, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য সুষমা কোনো দিক দিয়েই আকর্ষণীয় ছিল না। কোনো ধর্মপরায়ণ মুসলমান সেখানে প্রার্থনা করত না। অযোধ্যার জনৈক মুসলিম তাজ দর্শনকালে আমাকে বলেছিল পশ্চিম মুখে না ঢুকে, মূর্তি ছাপা দেওয়ালের খণ্ডাহারে সে বাবরি মসজিদে নমাজ পড়তে অনিচ্ছুক।

১৯৮৩ সালে মুম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজ থেকে ভি টি স্টেশনে আসার পথে রাস্তা জোড়া এক বিশাল জুলুসের মুখোমুখি হয়েছিলাম। সেই মিছিল থেকে ছিটকে এসে এক যুবক রামচন্দ্রের কারাবন্দি একটা ছোট্ট রঙিন ছবি আমার হাতে দিয়েছিল। ছবির তলায় লেখা, 'আগে বড়হো, জোরসে বোলো, জনমভূমিকা তালা তোড়ো।' সেদিনই অযোধ্যা মামলার কথা প্রথম জানি। তালা খুলিয়েছিলেন আমাদের অকালপ্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। মাতামহর মতো তিনি মেকিয়াভেলিপন্থী বোধ হয় ছিলেন না। থাকলে সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে আরো পাঁচশো বছর হয়তো কাটানো যেত। অযোধ্যায় মসজিদ বানানো, মক্কায় কৃষ্ণমন্দির নির্মাণের সমতুল। কাশীর জ্ঞানবাপি মসজিদের প্লিন্থ স্থাপত্য তো প্রকাশ্যে দেখা যায়।

তুরস্ক মূলে যায়নি। ১৩৩৪-এ থেমেছে। ভারতের সমস্যা বাইনারি। নরেন্দ্র মোদী মূলে গেলেন। তাই চটেছেন ওয়াইসি নামক ভদ্রলোক। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি 'সেকুলার' হতে বলেছেন, যে বিচিত্র শব্দটি আমাদের সংবিধানে ইন্টার্পোলেট করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। পৃথিবীর কোনো সভ্য, আধুনিক, উন্নত দেশ এই আধিক্যে (আদিখ্যেতায়?) ভোগে না। নিজের দেশকে সেকুলার বলাটা মানুষকে 'মনুষ্যত্ব যুক্ত মানুষ' ট্যাগ পৈতের মতো বহন করার সমান। আধুনিক রাষ্ট্র মাত্রই সেকুলার। বরং ইসলাম প্রধান কোনো দেশে সেকুলারিজম চীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মতোই অনুপস্থিত।

অবশ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার-কালার টিভির মতো হসপিটাল বনাম মন্দির-এর যুক্তিতে নাস্তিক ফ্যান্টাসি চর্চার অবকাশও এখানে থাকবে।

পূজা ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

**Shree Nursing Timber and Electric Stores**

Poddar court, 18 Rabindra Sarani, Gate No 4,
2nd floor, Room No 718, Kolkata 700 001
Phone : 2235 5210. 2109

# ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি কথায় ও কাজে

**কল্যাণ কুমার নন্দী**

আমি শিক্ষক নই। হাজার চেষ্টা করলেও কেউ যে আমাকে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে না , এই বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিত। আবার নিজেকে শিক্ষিত বলে ঘোষণা করতে বা ভাবতেও আমার ঘোর আপত্তি আছে। বরং সদা সর্বদা শিখতে চাওয়া একজন শিক্ষানুরাগী সচেতন নাগরিক হিসেবে ভারত সরকারের পূর্বঘোষিত শিক্ষানীতিগুলির কথার সঙ্গে কাজের মিল অমিল এবং একই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সদ্যঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতির ভালো মন্দ উভয় দিকগুলি নিয়ে নির্মোহ আলোচনাই আমার আজকের এই নিবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সুদীর্ঘ পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে খণ্ডিত ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো তখন আমাদের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১২ শতাংশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিজেদের জগৎসভার শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলে সগর্বে ঘোষণা করত। আবার তাদের তৈরি একদল ভারতীয় দালাল সদা সর্বদা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতো যে, মূর্খ ও অজ্ঞ ভারতবাসীকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছে ব্রিটিশরাই। অথচ একটানা দুই শতক ধরে শাসন করে আসা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে ইংরেজ শাসকরা কতটা উদাসীন ছিল তার প্রমাণ মিলবে ব্রিটিশ ভাইসরয় মেয়ো সাহেবের হাতে শুরু করা জনগণনার তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর দৃষ্টিপাত করলে। ১৮৮১ সালে করা প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনায় ভারতের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। ১৮৮১ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি ৬৬ বছরে ব্রিটিশ সরকার সাক্ষরতার হারকে ৪ থেকে ১২ শতাংশে নিয়ে গিয়েছিল।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষাবিস্তারের এই রকম অভূতপূর্ব ভয়ংকর রেকর্ড থাকার কারণে স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের উচিত ছিল শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অশিক্ষারূপী এই গ্লানিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সবার আগে দূর করা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে শিক্ষার প্রসারকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া কারণ অশিক্ষা চিরকালই যে কোনো অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কী দেখল? রাজ্য সরকারগুলির কাঁধে শিক্ষার দায়িত্বভার চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন পণ্ডিত নেহেরু। এই সিদ্ধান্তের ভিতর কতটা পাণ্ডিত্য লুকিয়ে ছিল তার উত্তর আমার জানা নেই। স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর মানুষকে বছরের পর বছর ধরে অশিক্ষার অতল অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে দেওয়াটা যে পাপ একথা বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। ভাবীকালের ভারতবর্ষ নেহরুর করা হিমালয় সদৃশ অনেক ভুল ও পাপের মধ্যে তার এই শিক্ষা প্রসারকে প্রাপ্য গুরুত্ব না দিয়ে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে মূর্খ ও অচেতন বানিয়ে রেখে দেওয়ার কৌশলকে মহাপাপ বলেই গণ্য করবে। মানুষকে বোকা ভাবা এবং বোকা বানিয়ে রাখা এই দুটি কাজের কোনোটাই একটানা চলতে পারে না। ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা গেল ১৯৫৯ সালের ১৮ শতাংশ থেকে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ শতাংশ

**শিক্ষানীতি গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের মোদী ফোবিয়ায় আক্রান্ত একদল মানুষ ক্ষুধিত পাষাণের পাগলা মেহের আলির মতো তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করেছে 'তফাত যাও— সব ঝুঠ হ্যায়, সব ঝুঠ হ্যায়'। এই দেশের মানুষ মেহের আলিদের চেনেন। তাই তারা জানেন পারলে মোদীই পারবেন অন্য কেউ নয়।**

হয়েছে। দশ বছরে মাত্র দশ শতাংশ বৃদ্ধির পরেও ভারত সরকারের টনক নড়ল না। ১৯৬৪ সালের ১ যে সংসদে ভারত সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে দিলেন কংগ্রেস দলেরই এক সাংসদ সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ। তার তীব্র আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে গেলেন জওহরলাল নেহরু। তিনি প্রশ্ন করে বসলেন স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও গোটা দেশের জন্য কোনো সার্বিক শিক্ষানীতি নেই কেন? পণ্ডিত নেহরুর কাছে এর কোনো যথাযথ উত্তর ছিল না। নির্বাক নেহরুকে ঈশ্বর তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো সুযোগ দিলেন না। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যু হলো। জয় জওয়ান, জয় কিসান উদঘোষের মধ্যে দিয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রী নেহরুর পাপমোচন শুরু করলেন। তার নির্দেশে ১৯৬৪ সালের ১৪ জুলাই ভারতের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হলো। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক দৌলত সিংহ কোঠারির নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের এই কমিশন ওই বছরের ২ অক্টোবর তার কাজ শুরু করে। বিষয়ভিত্তিক ১২টি টাস্কফোর্স এবং ৭টি কার্যকরী গোষ্ঠী তৈরি করে ১০০ দিন ধরে সারা দেশ ঘুরে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ৯০০০ মানুষের মতামত নেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাছ থেকে ২৪০০-র বেশি স্মারকলিপি ও নোটস নিয়েছিল এই কমিশন। ২১ মাসের নিরলস পরিশ্রমের পর ১৯৬৬ সালের ২৯ জুন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহম্মদ করিম চাগলার কাছে কোঠারি কমিশন তার সুপারিশ-সহ ছয়শত পাতারও বেশি বিস্তারিত মূল্যবান রিপোর্টটি পেশ করে। ইতিমধ্যে ১৯৬৬-র ১১ জানুয়ারি সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর। নেহরু তনয়া ইন্দিরা দেশের প্রদানমন্ত্রী হয়েছেন। অধ্যাপক কোঠারি রিপোর্টের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীকে লেখা তার চিঠির শেষ লাইনে লিখেছিলেন— 'What the situation urgently calls for is action and this is what you have always stressed.' দুঃখের বিষয় কমিশন চেয়ারম্যানের অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার এই অনুরোধ এবং শিক্ষামন্ত্রীর ইচ্ছাকে তিলমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে পুরো দুই বছর ফেলে রাখার পর ১৯৬৮ সালের ২৪ জুলাই বেশ কিছু সুপারিশ ছেঁটে ফেলে দিয়ে ভারত সরকার রিপোর্টটি গ্রহণ করে।

**এতকাল আমাদের দেশে শিক্ষা ছিল জীবিকা অর্জনের জন্য এক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিহীন ব্যবস্থাপনা। একজন বিদ্যার্থী পথের শেষে তার কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে কী পারবে না তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। লক্ষ লক্ষ হতাশ শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য ধুকতে ধুকতে চলা এক একটি কারখানায় পরিণত হয়েছে আমাদের দেশের বেশিরভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।**

কমিশনের প্রস্তাব ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ খরচ করতে হবে এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের ভিতরে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। আমাদের দেশে রাজ্য সরকারগুলির সেই সময়কার আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে কিছুতেই শিক্ষাক্ষেত্রে ওই হারে অর্থ খরচ করার ক্ষমতা ছিল না। শিক্ষাকে রাজ্যের তালিকায় ফেলে না রেখে যৌথ তালিকায় এনে কেন্দ্র

ও রাজ্য সরকার একযোগে আরো বেশি বেশি করে অর্থ বরাদ্দ করলে তবেই কোঠারি কমিশনের গৃহীত সুপারিশগুলির রূপায়ণ সম্ভবপর ছিল। ইন্দিরা গান্ধী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিক্ষাকে রাজ্যের তালিকাতেই রেখে দিলেন। ফলে রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে না পারল প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে, না পারল তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করে দেশের মানুষের কণ্ঠরোধ করলেন শ্রীমতী গান্ধী। নিজের হৃত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের জন্য হঠাৎ সরকার কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ধুলো ঝেড়ে বার করলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব আনার ধুয়ো তুলে তিনি শিক্ষাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকায় নিয়ে এলেন অথচ কমিশন নির্দেশিত ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির দিকে এতটুকু এগোলেন না। ফলে আমরা ২০১৯ সালে এসেও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দের তালিকায় পৃথিবীর ১৯৭টি দেশের ভিতর ১৪৩ নম্বরে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভুটানও এই ক্ষেত্রে আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে এসে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি দেখলেন কোঠারি কমিশনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ অথচ আমরা লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারিনি। মুক্ত বাজার অর্থনীতির হাত ধরে বিশ্বায়নের ঢেউ এসে আমাদের হাজির করে দিয়েছে কমপিউটার এবং ইন্টারনেট বিপ্লবের সামনে। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা পড়ে আছি মান্ধাতার আমলে। ভারতীয় সংবিধান নির্দেশিত ১৪ বছর বয়সসীমার সব ছেলেমেয়েদের নিঃশুল্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি। শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে মানোন্নয়ন করা হয়নি। ত্রিভাষা সূত্রের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে অহিন্দিভাষী এলাকায় জনপ্রিয় করা এবং হিন্দিভাষী এলাকায় আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে পরিচিত করা। এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এবং ভারতীয় জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির রক্তে মাংসে মিশে থাকা সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও আধুনিকীকরণের কাজ অথৈ জলে। প্রথম শিক্ষা কমিশনের দেওয়া মূল কাজগুলির একটি ক্ষেত্রেও সরকার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি।

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর পাকিস্তানের মদতপুষ্ট খালিস্থানী উগ্রবাদীদের হাতে প্রাণ হারালেন ইন্দিরা গান্ধী। সংকটকালে ভারতবর্ষ পেল এক তরুণ প্রধানমন্ত্রী। রাজীব গান্ধী শিক্ষা দপ্তরের নাম বদলে দিয়ে করলেন মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর। নরসীমা রাও-কে দিলেন বিভাগের দায়িত্ব। পদে আসীন হয়েই নরসীমা রাও ডাকযোগে শিক্ষা বা মুক্ত শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে ১৯৮৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করলেন। ভারতবর্ষের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে তার এই কাজটি একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে লাগাতার সরকারি ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তরুণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নির্দেশে ২২ বছর বাদে ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশনটি গঠিত হলো। এই কমিশনের সুপারিশ ছিল মুক্ত শিক্ষা, বয়স্ক নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। এছাড়া কমিশন সরকারের নজরে আনেন শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে শিশু সন্তান ও তার মায়ের শারীরিক মানসিক উন্নয়নের বিষয়টিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাজীব গান্ধীর সরকার কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট সার্ভিসেস (ICDS), বালওয়ারি, অঙ্গনওয়াড়ি, নবোদয় বিদ্যালয়, স্কুল কলেজে কম্পিউটার শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষাপ্রসারের কাজে এই সময় বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়। রাজীব গান্ধীর বেদনাদায়ক অকাল মৃত্যুর পর নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯২ সালে তিনি শিক্ষানীতিতে আরো কিছু সংশোধন ও সংযোজন করেন। বিদ্যালয় মধ্যাহ্ন ভোজন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, ম্যানেজমেন্টের পেশাদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বভারতীয় ভর্তির পরীক্ষা তার সময়েই চালু হয়।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি জোট সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. মুরলীমনোহর যোশী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির যৌথ পরিচালনায় ২০০১ সালে গ্রহণ করলেন স্বাধীন ভারতের সর্বাধিক আলোচিত এবং কার্যকরী ফলদায়ক বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মসূচি সর্ব শিক্ষা অভিযান। নতুন নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও মেরামতি, প্রতি দু'কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মতো বহুবিধ বৈল্পবিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। এই কর্মসূচির সব চাইতে বড়ো সাফল্য হলো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে একলপ্তে বিশাল অঙ্কের সরকারি অর্থ বরাদ্দ হতে থাকা। বাজপেয়ী সরকার চলে যাবার পর ড. মনমোহন সিংহের পর পর দুটি সরকার এসে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন পাশ করা হলো। লাগাতার সরকারি চেষ্টার ফলে শিক্ষার প্রসার এবং বিস্তারের কাজের ফল আমরা পেতে শুরু করেছি। সাক্ষরতার হারে বৃদ্ধি ঘটতে ঘটতে আজ প্রায় ৭৮ শতাংশে পৌঁছে গেছে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো বরাদ্দ বৃদ্ধির সঙ্গে নতুন নতুন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই নরেন্দ্র মোদী সরকার ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্বতন ক্যাবিনেট সেক্রেটারী টি.এস.আর সুব্রহ্মনিয়ামের নেতৃত্বে বিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহ করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি এক বছরের বেশি সময় ধরে সব রাজ্য সরকার ও শিক্ষা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ২০১৬ সালের মে মাসে সরকারের কাছে তার তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্টটি দাখিল করে। রিপোর্টটি খতিয়ে দেখে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর 'খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৬-র জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলী' শীর্ষক একটি পেপার তৈরি করে। মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রকাশ জাওড়েকর ২০১৭ সালের জুন মাসে ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কে. কস্তুরীরঙ্গনের হাতে সুব্রহ্মনিয়ম কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি বিভাগীয় 'খসড়া

শিক্ষানীতির জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলী' শীর্ষক পেপারটি তুলে দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের নতুন একটি শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ছয় মাসের ভিতর কমিশনকে তার সুপারিশ-সহ খসড়া রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়। দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের ৩৪ বছর পরে গঠিত এই তৃতীয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন ছয় মাসের জায়গায় প্রায় দেড় বছর সময় নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত লক্ষের বেশি মানুষের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। ২০১৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯' নামের প্রায় পঁচিশ পাতার বেশি এক বিশদ রিপোর্ট ভারত সরকার কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জমা দেন। লোকসভা ভোটের পর নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে রমেশ পোখরিয়ালকে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব দেন। ২০২০ সালের ২৯ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ড. কে. কস্তুরীরঙ্গন কমিটির রিপোর্টটি বিধিবদ্ধ রূপে গ্রহণ ও অনুমোদন করলেন। ঘোষিত হলো ২০২০ সালের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি।

এবারে আমরা ঘোষিত এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব। মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরকে আবার মতো শিক্ষা দপ্তর বলা হবে। এতকাল আমাদের দেশে শিক্ষা ছিল জীবিকা অর্জনের জন্য এক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিহীন ব্যবস্থাপনা। এই লম্বা যাত্রাপথের শেষ কোথায় এবং একজন বিদ্যার্থী যদি বা পথের শেষে পৌঁছেও যায় সে তার কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে কী পারবে না তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। লক্ষ লক্ষ হতাশ শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য ধুকতে ধুকতে চলা এক একটি কারখানায় পরিণত হয়েছে আমাদের দেশের বেশিরভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। দিনের পর দিন ধরে এই অচল শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ছাত্রসমাজকে হতাশা থেকে নেশাগ্রস্ততা ও আত্মহত্যার রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে। তাই নতুন শিক্ষানীতিতে জীবিকা নয় জীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার অভিমুখ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতি কাজ খোঁজা একপাল শিক্ষিত বেকার তৈরি করবে না। তৈরি করবে আগামীদিনের অসংখ্য শিক্ষিত কর্মদাতা উৎসাহী উদ্যোগপতিদের। শিক্ষা ব্যবস্থার শুরুতেই আনা হয়েছে বদল। ৬-১৪ বছরের বদলে শিক্ষা পাবার অধিকারের আওতায় আনা হয়েছে ৩-১৮ বছরের প্রত্যেককে। তিন + বয়স থেকে শুরু হবে শিক্ষা গ্রহণ। প্রথম তিন বছরের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা হবে বই ছাড়া শিক্ষা। এই তিন বছর শিশুটির কাছে বিদ্যালয় হবে শরীর মনের পুষ্টি ও বিকাশের জায়গা। খেলাধুলা, গল্প, নাচ, গান, অভিনয়, আঁকা, হাতের কাজ, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সে নিজের মতো বেড়ে উঠবে। এর পর আসবে দুই বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। এর প্রথম তিন মাসে তাকে খেলাধুলার ভিতর দিয়েই বিদ্যালয় জিনিসটা কী, এখানে এসে তাকে কী করতে হবে, কী কী তার করা ঠিক হবে না এই ধারণাগুলি মনের ভিতর আস্তে আস্তে গেঁথে দেওয়া হবে যাতে তার বিদ্যালয় ভীতি কেটে যায়। এর পর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বছরের প্রস্তুতি পর্ব। এই পর্যায়ের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হবে। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম এই তিন শ্রেণীর শিক্ষাকে প্রাক মাধ্যমিক স্তর বা মধ্যম স্তর বলা হচ্ছে। এই স্তরে কম্পিউটার, ভোকেশনাল, বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুরু হবে। সম্ভব হলে এই স্তরেও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে। মাধ্যমিক স্তরে নবম থেকে দ্বাদশ চার বছরে ছয় মাসের ৮টি অভিন্ন সেমিস্টার ভাগ করে পরীক্ষা নেওয়া হবে। বোর্ডের পরীক্ষা থাকবে। বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য এইসব বিভাগ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যার্থী তার পছন্দের বিষয় বেছে নিয়ে পড়তে পারবে। কারো ইতিহাসে রুচি থাকলে সে অঙ্কের সঙ্গে ইতিহাস নিয়ে পড়তে পারবে। প্রাথমিক মাধ্যমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত অসংখ্য এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়েছে এবারের এই নতুন শিক্ষা নীতিতে যা এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে বিশদ আলোচনা করা কখনোই সম্ভবপর নয়।

আগের দুটি শিক্ষানীতিতেও অনেক ভালো ভালো সুপারিশ ছিল। সেই সব ভালো ভালো কথাগুলি কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনো সরকারই পুরোপুরি কার্যকর করতে না পারার মূল কারণ কোঠারি কমিশনের সুপারিশ মেনে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ টাকা সরকার কোনোদিন শিক্ষাখাতে ব্যয় করেনি। নতুন শিক্ষা কমিশন ৫২ বছর বাদে আবার সেই একই সুপারিশ করেছে। এবারেও সরকার যদি ৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় না করে তবে শিক্ষা কমিশনের ভালো ভালো কথাগুলি সরকারি নথির পাতায় পাতায় ভালো কথা হিসেবেই থেকে যাবে, কাজে পরিণত হবে না। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ আমেরিকা ৬.২ শতাংশ ব্যয় করলেও নরওয়ে ব্যয় করে ৬.৪ শতাংশ। আবার উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বলিভিয়া ৬.৪ শতাংশ, কোস্তারিকা ৬.৯ শতাংশ, জামাইকা ৬.৩ শতাংশ, ব্রাজিল ৬.৩ শতাংশ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। সেখানে আমরা করি মাত্র ৪.৪ শতাংশ। এই শিক্ষানীতি গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের মোদী ফোবিয়ায় আক্রান্ত একদল মানুষ ক্ষুধিত পাষাণের পাগলা মেহের আলির মতো তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করেছে 'তফাত যাও— সব ঝুঠ হ্যায়, সব ঝুঠ হ্যায়'। এই দেশের মানুষ মেহের আলিদের চেনেন। তাই তারা জানেন পারলে মোদীই পারবেন অন্য কেউ নয়। মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। □

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

# ইতিহাসের বিকৃতি রাজনৈতিক চক্রান্তের অংশবিশেষ

**সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগে ভুল ইতিহাসকে ভোলাতে হবে। কিন্তু যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা এখন নাগালের বাইরে সুতরাং তাদের কথা বাদ দিয়ে চলা শুরু করতে হবে। নতুনদের নিয়ে নতুন, সঠিক ও সত্য ইতিহাসের যাত্রা শুরু হবে।**

**বীরেন্দ্রনাথ শুকুল**

বিকৃত ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক।" যিশুখ্রিস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাঁহাকে খর্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব হইতেছি। ইংরেজদের ছেলে জানে, তাহার বাবা পিতামহ অনেক যুদ্ধ জয়, অনেক দেশ অধিকার ও বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়াছে; সেও নিজেকে রণগৌরব, ধনগৌরব ও রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি আমাদের পিতামহগণ দেশ অধিকার ও বাণিজ্য ব্যবসায় করেন নাই। এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাসের তাহারা কী করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কী করিব তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়। ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া, ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ ভাব জন্মে।"।

এই আক্ষেপ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, এই আক্ষেপ জাতীয়তাবাদী প্রত্যেক মানুষের। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এবং তাদের অন্ধ অনুকরণকারীরা এই উপলব্ধির বাইরেই থেকেছে, এখনও আছে। তাই স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের ইতিহাস লেখার দরকার--- এই ধারণা এক শ্রেণীর পরাণুকরণকারী লেখকদের উদ্বুদ্ধ করেনি। তাই তাদের লিখিত ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস হয়ে ওঠার পরিবর্তে এক বিকৃত ইতিহাস হয়ে উঠেছে। কোনো দেশে ইতিহাস লেখার কাজ, সেই দেশে জাতীয় শিক্ষানীতির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরও এক সদর্থক জাতীয় পুনরুত্থানের অনুকূল জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে ওঠেনি। কমিশনের পর কমিশন হয়েছে কিন্তু তা ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেছিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালের গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনেকটাই ত্রুটিমুক্ত হলো। বিজেপির শাসনকালে এনসিইআরটি এই মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার যে প্রয়াস নিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট তার বিরুদ্ধে যায়নি। বামপন্থীদের এক মামলার রায়ে সুপ্রিমকোর্ট একথা জানায়। ইতিহাস বিকৃতির রাজনৈতিক অভিসন্ধি কখন শুরু হলো, কারা শুরু করল?

একটি দেশ বা জাতিগঠনে সেই দেশের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বর্তমান প্রজন্মকে জানতে হবে ঠিক কী ঘটেছিল অতীতে। কারণ তার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই সেই দেশ কীভাবে এগিয়ে যাবে তা স্থির হবে। জওহরলাল নেহরু রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ইতিহাস লেখার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু তিনি তার ধারণা মতো কিছু সিদ্ধান্তকে কেন্দ্রে রেখে ইতিহাস রচনার উপকরণ জোগাড় করতে বলেন। ড. রমেশচন্দ্র এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। অবিলম্বে ওই দায়িত্ব দেওয়া হলো ড. তারাচাঁদকে। বিশ বছর ধরে এক লক্ষ টাকা বছরে বরাদ্দ হলো। পরবর্তীকালে জাতীয় ইতিহাস লেখার নামে টাকা লুঠ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য অনুযায়ী ইতিহাস উপস্থাপিত করে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছে স্বাধীনোত্তর কালের ভারতীয় পুনরুত্থানকে।

**বিকৃতকরণ :** ব্রিটিশরা চলে যাবার পর ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে হেয় করার কাজ যারা গ্রহণ করেছিল, যারা পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকেই সব কিছুর ভাষ্য গঠনে সর্বদা অতি তৎপর, ভারতের জাতীয় পুনরুত্থান যারা অবাঞ্ছিত মনে করে সেইমতো ইতিহাস রচনাকে প্রগতিশীল কাজ বলে মনে করে, তাদের মধ্যে রোমিলা থাপার, অর্জুনদেব, ইন্দিরা দেব, রামশরণ শর্মা, সতীশ চন্দ্র উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দাক্ষিণ্যে এদের বইগুলি এনসিআরটি-র ইতিহাস বই পাঠ্য ছিল দীর্ঘকাল। মার্কসীয় শিক্ষামন্ত্রীর বদান্যতায় লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছে বিকৃত ইতিহাসকে পণ্য করে। এরা লিখেছেন— 'প্রাচীন ভারতে আর্যরা গোমাংস খেত কিন্তু তারা শুয়োরের মাংস খেত না। আবার বলা হয়েছে, লোকে গোরু, ছাগল, মহিষ, শূকর পশুপালন করত। শূকর মাংস কেউই খেত না— এখানে হিন্দু সেন্টিমেন্টে আঘাত দেবার সুচতুর প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। এনসিআরটি বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সাভারকর, প্রফুল্ল চাকী, খুদিরাম, ভগত সিংহ এরা সবাই সন্ত্রাসবাদী। ভারতমাতার সুসন্তানদের সম্বন্ধে শিশুমনে একটা বিরূপতা সৃষ্টি করার প্রয়াস--- যা বর্তমান সময়ের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সাদৃশ্য আনার অপচেষ্টা মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার সংখ্যালঘু তোষণ ও বিকৃত ইতিহাস রচনা করার প্রয়াসে সচেষ্ট হয়। বিভিন্ন লেখক যে সমস্ত বই টেক্সট বই হিসেবে সরকারি অনুমোদন পেয়েছেন তা আবার শুদ্ধিকরণ করতে হবে— লাইনের পর লাইন বাদ দিয়ে। এই সমস্ত ঘটনা অনেকের স্মরণে থাকতে পারে— বিশেষত যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। এই সংক্রান্ত আদেশনামা ১৮ এপ্রিল, ১৯৮৯, নাম্বার Sly/89/1. উদাহরণ হিসাবে

বলা যায় ভারতকথা-IX, লেখক সুখময় দাস। অশুদ্ধ ১৪০ পৃষ্ঠায় সিন্ধুদেশে আরবরা হিন্দুদের কাফের বলেন নাই। তারা গোবধ নিষেধ করেছিলেন। বাদ দিতে হবে গোবধ, নিষেধ করেছিলেন। পৃ.- ১৪১, বল প্রয়োগের সাহায্যে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে— যা আগ্রাসনের উদাহরণ। বল প্রয়োগের সাহায্যে বিবাহযোগ্যা মহিলাদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ করিয়ে মৌলবাদ প্রতিষ্ঠা, উলেমাদের এক প্রচেষ্টা। শুদ্ধ হবে— সমস্তটা বাদ দিতে হবে। বই ভারতবর্ষের ইতিহাস— ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃ.-৮৯ অশুদ্ধ— সুলতান মামুদ বলপ্রয়োগের সাহায্যে সর্বব্যাপী খুন, লুঠ, ধ্বংস ও ধর্মান্তরকরণ চালান। শুদ্ধ— সর্বব্যাপী লুঠ ও ধ্বংস চালান। খুন বা ধর্মান্তরকরণের কোনো প্রমাণ নেই। অশুদ্ধ— তিনি ২ কোটি দিরহাম মূল্যের মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করেন। সোমনাথ মন্দির থেকে শিবলিঙ্গটি লুঠ করে গজনির মসজিদের সিঁড়ি করেন। শুদ্ধ— শিবলিঙ্গকে মসজিদের সিঁড়িরূপে ব্যবহার করেন বাদ দিতে হবে। পৃষ্ঠা-১১৩, ইসলামের সিদ্ধান্ত অনুসারে অমুসলমানদের যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে— ইসলাম কবুল কর অথবা মৃত্যু। একমাত্র হানিফই অমুসলমানদের জিজিয়া করের বিনিময়ে জীবন রক্ষা পেতে পারে। শুদ্ধ— আলাউদ্দিন খিলজিকে জিজিয়া কর দিয়ে অমুসলমানরা সাধারণ জীবনযাপন করবে। বাকিটা বাদ দিতে হবে। বই ভারতের ইতিহাস- পি. মাইতি। অশুদ্ধ— পর্দা প্রথা আভিজাত্যের একটা প্রকাশ। এই প্রথাকে অভিজাত হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছে। অন্য এক মত বলছে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই অভিজাত হিন্দুরা এই প্রথা প্রচলন করেন। খুব সম্ভব এই প্রথার পিছনে দুটো কারণই হতে পারে। শুদ্ধ— সমস্তটা বাদ দিতে হবে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতে এসে এখানকার বিজ্ঞান ভিত্তিক সামাজিক কাঠামো, উন্নত ভাষা প্রাচীন ভাস্কর্য স্থাপত্য ইত্যাদির কিছুটা জেনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। নানা দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা ভারতীয়দের বহিরাগত আর্যতত্ত্ব চালু করেন এবং তাদের ভাষাতেই বই চালু করেন। তাদের ভাষাতেই বই প্রকাশ করেন। সেই সময় এই দেশের কেউ তাদের ভাষা তেমন জানত না যার সাহায্যে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা যায়। দুশো বছর ইংরেজ থাকার ফলে প্রচারিত এই তত্ত্ব অনেকাংশেই স্বাভাবিক সত্যে পরিণত হয়েছিল। মহেঞ্জো দাড়ো হরপ্পার মতো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার কিছুটা নাড়া দিয়েছিল। উন্নত যুদ্ধকৌশল, বণিকের মানদণ্ড ও বাইবেল নিয়ে যারা ভারতকে গ্রাস করতে এসেছিল তারা মূলত কিছু ব্যতিক্রমী পণ্ডিত ছাড়া আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতাই বজায় রেখেছিল। মেকলের সাহায্যে এমন শিক্ষানীতি তৈরি করেছিল যার সাহায্যে আর্যরা অনুপ্রবেশকারী— এই ধারণা স্থায়িত্বলাভ করেছিল। একটা ঘটনা মেকলেকে প্রভাবিত করেছিল। একজন ইংরেজ একবার দেখলেন এক ভারতীয় অফিসার রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এক নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে প্রণাম করছেন। তখন ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চান কারণ কী? অফিসার জানান উনি ব্রাহ্মণ তাই সামাজিক ভাবে তিনি সম্মাননীয় ও প্রণম্য। ইংরেজরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙতে সচেষ্ট হলো। তাই মেকলে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কথা বলেন যাতে এদেশের লোক শারীরিকভাবে ভারতীয় থাকবে কিন্তু মানসিকভাবে ইংরেজ হয়ে যাবে।

পরবর্তীকালে স্বাভিমান যখন জেগে উঠল তখন নতুন বিশ্লেষণ শুরু হলো। কিছুকাল আগেও পাশ্চাত্যে দশ হাজারের বেশি সংখ্যার ধারণা ছিল না। হিন্দু সভ্যতার কাছ থেকে শূন্য এবং দশমিকের ধারণা নিয়ে তাদের সংখ্যার ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়েছে। আর্য আগমন তত্ত্ব খাড়া করে তাদের কাল নির্দিষ্ট করেছে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে। পুরাণে বর্ণিত আছে পাতল দেশের সঙ্গে (দক্ষিণ আমেরিকা) এই গোলার্ধের যোগাযোগের কথা। সেই দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এবং পরম্পরায় ভারতীয় সভ্যতার লক্ষণ প্রকাশ এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। দু'জন প্রফেসর মেক্সিকোতে কোনো বিশেষ বিষয়ে গবেষণার কাজে যান। এক সময় জুতোর দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। জুতো পছন্দ হবার পর তার মূল্য দিতে গিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে তারা ভারতীয়, তখন দোকানদার জুতোর দাম ১/৩ ভাগ কমিয়ে দেন। দোকানদার মেক্সিকোবাসী, তারা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষ ভারতীয়। সেজন্য তারা গর্ব অনুভব করেন। এরিক ফন দানিকেন, যিনি কয়েকটি বই লিখেছেন— মায়া সভ্যতা, আজটেক সভ্যতা এবং সমমাময়িক সভ্যতা বিষয়ে, সেখানে যে ধরনের সংস্কৃতি, স্থাপত্য মূর্তির কথা আছে, তার সঙ্গে ভারতীয়দের ওই সব বিষয়ে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত এক আর্টিকেলে বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, গ্রিসদেশে এক ক্লাবে তার প্রতিষ্ঠা দিবসে উপনিষদের একটি শ্লোক (সংস্কৃতে) পাঠ করা হয়। আমেরিকার এক বিচারালয়ের সামনে এক মূর্তি আছে। মূর্তির নীচে লেখা আছে মনু— ফার্স্ট ল মেকার।

আর্য আগমন তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো প্রাচীন সংস্কৃত বইতে উল্লেখ নেই। আর্যকে একটি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাও যে সঠিক ছিল না, পরবর্তীকালে গবেষণায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে। এমনকী ম্যাক্সমূলার জীবনের শেষদিকে স্বীকার করেছেন আর্য আগমন তত্ত্ব ঠিক নয়। আর্য একটি জাতি হিসাবে মনে করা ভুল। প্রকৃষ্ট আচরণ যিনি করেন তিনিই আর্য। এই আচরণের মধ্যে অন্যতম হলো ব্যবহার ও উচ্চারণ। ঋকবেদে আর্যশব্দের প্রয়োগ আছে বত্রিশবার। ভাষ্যকার সায়নাচার্য আর্য শব্দের নয়প্রকার অর্থ নিরুপণ করেছেন। কিন্তু কোনোটিই জাতিবাচক নয়। সপ্তসিন্ধুর দেশ থেকে যে ভারতীয় (আর্যরা) ইরানে গিয়েছিল তার উল্লেখ আছে জেন আবেস্তাতে। ঋকবেদে সমুদ্রযাত্রা বন্দর এবং সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত ১০০ দাঁড়বাহী বড়ো নৌকার বিবরণ আছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি যে বিপুল সংখ্যক শহরের ভগ্নাবশেষের কথা জানিয়েছে তার মধ্যে ৫০০টিই সরস্বতী নদীর ধারে। বেদের মন্ত্রে এই সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। নদীখাতের নীচে ভুগর্ভস্থ জলের বয়স ছয় হাজার বছরেরও বেশি। সরস্বতী অববাহিকায় প্রায় ১৩০০ প্রাচীন জনপদের সন্ধান পাওয়া যায়। ঋকবেদ সম্পাদনার কাজে ম্যাক্সমূলার ভারতের মাটিতে পা রেখেই, ভারতকে না জেনেই বনে গিয়েছিলেন ভারততত্ত্ববিদ। গোমাংস খাওয়ার কথা নাকি উল্লেখ আছে বেদে, কিন্তু সেই বেদেই পাচ্ছি —

সুসবস্যাৎ ভগবতী হি ভূয়া
অথো বয়ং ভগবন্ত স্যাম।
অদ্ধি তৃণং অগ্নে বিশ্বদানীম্
পিব শুদ্ধ্যম উদকম্ আচরন্তী।

প্রচুর শস্যে ধরিত্রী ঐশ্বর্যশালিনী হউন। অনন্তর আমরাও ঐশ্বর্যশালী হইব। হে অবধ্য গাভী সর্বদা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া নির্মল বারি পানও তৃণ ভক্ষণ কর।

মার্কসীয় পণ্ডিত ইতিহাসকাররা লিখেছেন বৈদিক আর্যরা তো অসভ্য বর্বর, কৃষিজীবী ও পশুপালক।

ইতিহাস জানার প্রয়োজন এই জন্যই যে, ইতিহাস স্মরণ রেখে একটা জাতির উত্থান ঘটে। গৌরবজনক ইতিহাস থাকলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করবে এবং

অগৌরববের কিছু থাকলে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিশীলিত ভূমিকা গ্রহণ করবে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের প্রাধান্য ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে— জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়েছে কিন্তু তা ব্যাপক কোনো রক্তাক্ত ইতিহাসের মাধ্যমে নয়, যেমনটা ঘটেছিল আরবে মুসলমান ধর্মের উদ্ভবে। বুদ্ধ হিন্দু অবতার হয়ে গেছেন, জৈনরাও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা। আমরা দেখেছি সত্যিকারের ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস কাদের কেন, কীভাবে। আমরা প্রমাণ-সহ এও দেখেছি কোন নৈতিকতার প্রেরণায় এই বিকৃতি ঘটানো হয়েছে এবং এই বিকৃতির প্রয়াসকে সুকৃতি বলে চালানো হয়েছে।

একটা গল্প ঃ এক জমিদারের একটা অবৈতনিক পাঠশালা খোলার ইচ্ছে হলো। সারা অঞ্চলে ঢেঁড়রা পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো— পাঠশলা খোলার কথা। জমিদারের পরিচিত একজন সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করেছে— সে পড়াবে। জমিদার তাকে জানিয়ে ছিল তার থাকা খাওয়া ফ্রি, মাসে কুড়ি টাকা তার বেতন। জমিদারের বাড়িতে হইহই করে স্কুল চালু হয়ে গেল। কিছু দিন যাবার পর শিক্ষকমহাশয় লক্ষ্য করলেন--- খাবার ক্রমশ নিম্নগামী এবং অর্থাগমের কোনো সম্ভাবনা নেই। তখন মনে এক পরিকল্পনা করে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। চারিদিকে খোঁজ করেও সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন অন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হলো। সে একইরকম সুবিধা সুযোগ পাবে কিন্তু মাস মাহিনা দ্বিগুণ। প্রথম দিন সে শ্রেণীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল পড়াশুনা ঠিকমতো হচ্ছিল কিনা? সবাই একবাক্যে হ্যাঁ উত্তর দিল। কিন্তু তাদের পড়া জিজ্ঞেস করাতে উত্তর শুনে চোখ ছাড়াবড়া। সেই দিনই শিক্ষক মহাশয় জমিদারকে তার পদত্যাগের কথা জানালেন। জমিদার জিজ্ঞেস করলেন— এমন কী হলো? অ আ ই ঈ-কে পড়ানো হয়েছে ই ঈ অ আ অর্থাৎ অ-কে বলা হয়েছে ই, আ-কে বলা হয়েছে ঈ আর ই-কে বলা হয়েছে অ এবং ঈ-কে শিখেছে আ। জমিদার আপনার ছেলে আপনাকে বাবা এবং আপনার স্ত্রীকে মা বলে। যদি আপনাকে মা ও স্ত্রীকে বাবা বলতে বলা হলে কতদিনে ঠিক হবে জানা নেই। এখানে বাহান্নটি অক্ষরকে কীভাবে সংশোধন করা হবে? আগে ভুলকে ভোলাতে হবে পরে ঠিক শেখানো যাবে।

আমাদের সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগে ভুল ইতিহাসকে ভোলাতে হবে। কিন্তু যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা এখন নাগালের বাইরে সুতরাং তাদের কথা বাদ দিয়ে চলা শুরু করতে হবে। নতুনদের নিয়ে নতুন, সঠিক ও সত্য ইতিহাসের যাত্রা শুরু হবে।

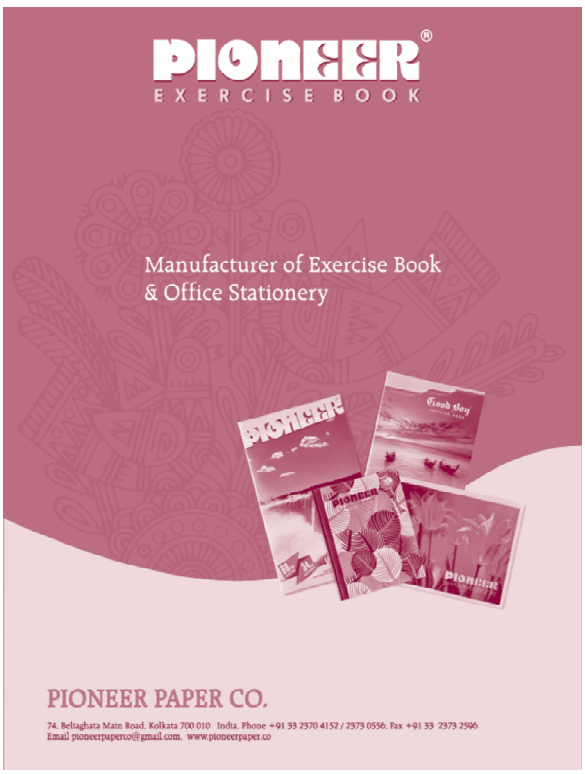

*With Best Compliments from :*

**A Well Wisher**

(A.T.)

# উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে

# একনজরে দুর্গাচৌমুহনী আর. ডি. ব্লক

**মনরেগা :—** ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এখনো পর্যন্ত দুর্গাচৌমুহনী আর. ডি. ব্লকে ৯,৭৫,০০০ শ্রমদিবস তৈরি করা হয়েছে এবং এই শ্রমদিবস তৈরির মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থকরী ফলের বাগান তৈরি, নদী ভাঙ্গন রোধে বাগান তৈরি, পুকুর তৈরি, চেকড্যাম, লুঙ্গা বাঁধ, সেচের জন্য নালা, পতিত জমি উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ তৈরির কাজ চলছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও কাজ চলছে।

**PMAY (G) :—** ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত ৪৭১টি ঘরের মধ্যে ইতিমধ্যে ৪৬৫টি পি. এম. এ. ওয়াই (গ্রামীন) ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

**SBM (G) :—** Swachh Bharat Mission (Gramin) প্রকল্পে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দুর্গাচৌমুহনী আর. ডি. ব্লকে ১০,০০০-এরও বেশি IHHL তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া Social Waste Liquid Management-এর অধীন হালহালী, মানিকভাণ্ডার, বামনছড়া, মরাছড়া সহ বিভিন্ন গ্রামীন বাজারগুলিতে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে Dustbin প্রদান করা হয়েছে।

**PMAGY :—** Pradhan Mantri Adarsha Gram Yojana -তে দুর্গাচৌমুহনী আর. ডি. ব্লকের অধীন ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীন রাস্তাঘাট, পানীয় জলের উৎস, বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে শৌচাগার তৈরি, গ্রামীন বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু করা হয়েছে।

**পঞ্চায়েত উন্নয়ন ফান্ড ও Fourtenth Finance Commission :—** পঞ্চায়েত উন্নয়ন ফান্ড ও Fourtenth Finance Commission-এর অর্থ ব্যায়ে দুর্গাচৌমুহনী আর. ডি. ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রামীন রাস্তা, পানীয় জলের উৎস তৈরি ও সংস্কার, গ্রামীন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাস্তার স্ট্রীট লাইট, বাজার, বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলির শৌচাগার তৈরি, শ্মশানঘাট তৈরি ইত্যাদি কাজ করা হচ্ছে এবং গ্রামীন এলাকায় স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা হচ্ছে।

Advt.

জনগণের সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজের দুর্বল মানুষের সার্বিক মানোন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও যোগাযোগ সহ ন্যূনতম পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমস্ত প্রতিকূলতার প্রাচীর চূর্ণ করে জাতি উপজাতির ঐক্যে আমরা এগিয়ে চলেছি।

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

# ধলাই জিলা পরিষদ

আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা

## জনগণের সেবায়

# আমবাসা পৌর পরিষদ

আমবাসা, ত্রিপুরা

**জমিতে চুন ব্যবহারের উপকারিতা :—**

- মাটিতে অম্লত্ব হ্রাস করা।
- মাটির ভৌতিক গঠন উন্নত করা।
- মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অনুখাদ্যের যোগান দেওয়া।
- মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি করা।
- মাটি থেকে ফসলের প্রয়োজনীয় মুখ্য খাদ্য উপাদান উত্তোলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- শিম্বিগোত্রী উদ্ভিদ দ্বারা মাটিতে মিথোজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধে সাহায্য করা।
- ফসলের উপকারী জীবাণুর অনুকুল পরিবেশ তৈরি করা।
- মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের বিষক্রিয়া হ্রাস করা।
- মাটিতে চুন প্রয়োগের জন্য মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সুপারিশকৃত মাত্রা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

**জমিতে জিঙ্ক সালফেটের ব্যবহার:—**

- ভূমিকা : প্রোটিন সংশ্লেষ করে এবং বীজের গুণমান ও সমান পরিপক্কতা বজায় রাখা।
- অভাবজনিত উপসর্গ — ধান : পাতায় ধূসর বাদামী রঙের দাগ ও বর্ণহীনতা, পুরনো পাতা
- আকারে ক্ষুদ্র হয়ে যায়, ফসলের পরিপক্কতা অসমান ও বিলম্বিত হয়।
- ডাল শস্য : বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। হালকা সবুজ, হলুদ, অস্পষ্ট দাগ, ছোট পাতা, দেরিতে ফুল আসে।
- প্রয়োগবিধি : মূল জমিতে ২৫-৬০ কেজি প্রতি হেক্টরে দুই বছর অন্তর।

**জমিতে জীবাণুসার ব্যবহারের উপকারিতা :—**

- ফসলের উৎপাদনশীলতা ২০-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে।
- মাটিতে ২৫ শতাংশ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রতিস্থাপন করে।
- ফসলের বৃদ্ধিকে উদ্দীবিত করে।
- মাটির জৈবিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে।
- মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা পুনরুদ্ধার করে।
- ফসলকে খরা ও মাটিবাহিত রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

**কৃষি তত্বাবধায়ক**

**আমবাসা কৃষি মহকুমা**

**জওহরনগর, ধলাই ত্রিপুরা**

Advt.

Ministry of Health and Family Welfare
Government of India
national health agency

Health & Family Welfare Department
Government of Tripura
State Health Agency

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা
আয়ুষ্মান ভারত
PM-JAY

# আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা
## (পি.এম.জে.এ.ওয়াই)

Website : pmjay.gov.in / abpmjay.tripura.gov.in
টোল ফ্রি হেল্পলাইন ঃ ১৪৫৫৫/ ১৮০০৩৪৫৩৭৯৭

আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় (পি.এম.জে.এ.ওয়াই) অন্তর্ভুক্ত হোন ও বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে সঠিক চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণ করুন এই যোজনায় (পি.এম.জে.এ.ওয়াই) রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যের সমস্ত তালিকাভুক্ত সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে

### পি.এম.জে.এ.ওয়াই-এ কারা সুযোগ পাবেন?

১। Socio Economic Caste Census -এ যাঁদের নাম সুবিধাপ্রাপক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
২। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কার্ড (RSBY Card) ২০১৬ সালে বা এর পরে ইস্যু করা

### পি.এম.জে.এ.ওয়াই কার্ড (e-card) পেতে গেলে কী নিয়ে আসতে হবে ?

১। রেশন কার্ড (বাধ্যতামূলক), আধার কার্ড ( Aadhaar Card ) অথবা, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কার্ড ( RSBY Card ) ২০১৬ সালে বা এর পরে ইস্যু করা অথবা ভোটার আই ডি কার্ড ( Voter ID )
২। শিশুর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারি করা জন্মের সার্টিফিকেট অথবা শিশুর আধার কার্ড
৩। বিবাহ সূত্রে পরিবারে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলে ম্যারেজ সার্টিফিকেট

### পি.এম.জে.এ.ওয়াই - এর সুবিধা ঃ-

এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীরা হাসপাতালে ভর্তির আগে এবং পরে বিনামূল্যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা পাবেন। এছাড়া অস্ত্রোপচার, যাবতীয় ঔষধ এবং রোগীর খাদ্যও বিনামূল্যে দেওয়া হবে। পি.এম. জে.এ.ওয়াই প্রকল্পে মোট ১৩৫৪ ধরনের রোগ চিকিৎসার খরচের আওতায় আসবে।

ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতি
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার




## জাতীয় টীকাকরণ কর্মসূচী

| | | |
|---|---|---|
| ১) গর্ভবতী মহিলাঃ | টিটেনাস-ডিপথেরিয়ার দু'টি ডোজ চার সপ্তাহের ব্যবধানে। | ৪) শিশুর পরবর্তী টীকা ঃ (১বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত) |
| ২) শিশুর জন্মকালীন টীকা ঃ | • বি.সি.জি. ঃ- একটি ডোজ, এক বছরের মধ্যে।<br>• হেপাটাইটিস বি ঃ- একটি ডোজ, জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে।<br>• পোলিও ঃ- একটি ডোজ, জন্মের ১৫ দিনের মধ্যে। | • পোলিও ঃ- বুস্টার ডোজ ১৬ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে।<br>• জাপানিজ এনকেফালাইটিসের টীকা ঃ- দ্বিতীয় ডোজ -১৬ মাস থেকে ২৪ মাসের মধ্যে।<br>• ডি.পি.টি. ঃ- দু'টি ডোজ, প্রথম ডোজ - ১৬ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ডোজ - ৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে<br>• হাম-রুবেলা টীকা ঃ- দ্বিতীয় ডোজ -১৬ মাস থেকে ২৪ মাসের মধ্যে।<br>• টিটেনাস-ডিপথেরিয়ার ঃ- দু'টি ডোজ-১০ বছরে এবং ১৬ বছর বয়সে।<br>• ভিটামিন -এ সিরাপ ঃ- দ্বিতীয় ডোজ-১৬ মাসে। তৃতীয় থেকে নবম ডোজ-দ্বিতীয় ডোজ-থেকে ৬ মাস অন্তর অন্তর ৫ বছর বয়স পর্যন্ত। |
| ৩) শিশুর পরবর্তী টীকা ঃ (৬ সপ্তাহ থেকে ১বছরের মধ্যে) | • পোলিও ঃ- তিনটি ডোজ - ৬,১০,১৪ সপ্তাহে।<br>• পেন্টাভ্যালেন্ট টীকা ঃ- তিনটি ডোজ - ৬,১০,১৪ সপ্তাহে।<br>• রোটা ভাইরাসের টীকা ঃ- তিনটি ডোজ - ৬,১০,১৪ সপ্তাহে।<br>• এফ.আই.পি.ভি (fIPV) পোলিও টীকা ঃ- দু'টি ডোজ ৬ ও ১৪ সপ্তাহে।<br>• হাম-রুবেলা টীকা ঃ- প্রথম ডোজ পূর্ণ ৯ মাস থেকে ১বছরের মধ্যে।<br>• জাপানিজ এনকেফালাইটিসের টীকা ঃ- ৯ থেকে ১২ মাসের মধ্যে।<br>• ভিটামিন-এ সিরাপ ঃ- প্রথম ডোজ ৯ মাসে। | |

শিশুকে নিয়মিত টীকা দিলে,১১ টি মারণ রোগের হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করা যায়। এই টীকা সমস্ত সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিনামুল্যে পাওয়া যায়। আপনার শিশুকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

# ধলাই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

## আমবাসা ধলাই ত্রিপুরা

# District Profile

## Name of District :- Dhalai

## Name of Office :- District Information & Cultural Affairs office

## H/Q : Jawaharnagar

| Sl.No. | Name of Information Centre | TOTAL STAFF'S |
|---|---|---|
| 1. | Ambassa Information Centre | 02 nos |
| 2. | Kulai Information Centre | 02 nos |
| 3. | Salema Information Centre | 03 nos |
| 4. | Kamalpur Information Centre | 02 nos |
| 5. | Ganganagar Information Centre | 01 no |
| 6. | Gandachara Information centre | 02 nos |
| 7. | Raishyabari Information Centre | 02 nos |
| 8. | 82 miles Information Centre | 01 no |
| 9. | Manu information Centre | 02 nos |
| 10. | Chailengta Information Centre | 02 nos |
| 11. | Chawmanu Information Centre | 03 nos. |
| Total | 11 Nos I/C | 22 Nos |

**District ICA Office & Sub-Division ICA Office under Dhalai District.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | District Information & Cultural Affairs Office,Jawaharnagar | 22 nos. |
| 2. | Sub-Divisional Information & Cultural affairs Office,Kamalpur | 12 nos. |
| 3. | Sub-Divisional Information & Cultural Affairs Office,Gandachara | 05nos. |
| 4. | Sub-Divisional Information & Cultural Affairs Office, Longtharai Velly | 05 nos. |
| | Total | 44 Nos |

ধলাই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সৌজন্যে বিজেপি জোট সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রচারে জনসচেতনতা গড়ে তুলেছে

*With Best*
*Compliments from :-*

R K Global

NSE | BSE | MCX | NCDEX | MCX SX | NSDL

**R K Global**

*With Best Compliments from :*

# PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

**PAHARPUR HOUSE**

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# CHOOSE THE BEST

DURO™

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

TRIPLE HEAT TREATED

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

**BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS**

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | **P:** (033) 2265 2274 | **Toll Free:** 1800 345 3876 (DURO)

**Email:** corp@duroply.com | **Website:** www.duroply.in | **Find us on** duroplyindia